# নবদিশা

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার সন্ধানে


## বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে সবজি বাগানের ভাবনা
# এখন অন্য রাজ্যেও স্থান করে নিতে চলেছে

'নবদিশা' পত্রিকায় আমরা বরাবরই শিক্ষাঙ্গনে সবজি বাগান তৈরী করার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করে এসেছি। কারণ তা যেমন একদিকে মিড-ডে মিলের থালায় নতুন নতুন সবজি পড়ুয়াদের মুখে তুলে দিতে পারবে, তেমনই বাচ্চারা সবজি বাগান থেকে অনেক কিছু শিখতেও পারবে-যেমন কোন সবজি কিভাবে ফলাতে হয়, তার জন্য কিভাবে মাটি তৈরী করতে হয়, কি করে রোগ পোকা দমন-নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধ করতে হয় ইত্যাদি। তবে খুশি হওয়ার মতো পরিবর্তন এখন আমাদের চোখে পড়ছে নীতি-নির্ধারণের স্তরেও, যেখানে মানবসম্পদ ভাবনার সাথে যুক্ত করা হয়েছে বুনিয়াদী স্তরে পুষ্টির প্রাথমিক বিষয়টাও। খুব সাম্প্রতিক কালে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিদ্যালয় শিক্ষা সচিবদের জানিয়েছেন, মিড-ডে মিলের আহার্য তালিকায় নতুন নতুন উপাদান সংযোজিত করতে না পারলে শিশু পড়ুয়াদের একঘেয়েমি-জনিত-বিরক্তি কাটানো যাবে না। সে জন্য তিনি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন বাঙলার গ্রামীণ বিদ্যালয়ে পুষ্টিমান-সম্পন্ন সবজি বাগানের অনুসরণে দেশের অন্যান্য প্রান্তে সবজি বাগান গড়ে তোলার ওপরে। শুধু তাই নয়, এই পুষ্টি বাগান তৈরীতে পড়ুয়াদের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব তার একগুচ্ছ পরামর্শের মধ্যে বুনে দিয়েছেন অনেক নতুন ভাবনাও, যেখানে পুরো প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিই বিশেষত পঞ্চায়েত সমান ভাবে উদ্দীপনা নিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে আমাদের আজ পরিস্থিতি খুব ইতিবাচকতা-সমৃদ্ধ মনে হচ্ছে এই কারনে যে, দেরীতে হলেও আমাদের ভাবণা বীজ, যা প্রসুপ্ত ছিল বিচ্ছিন্নতার মধ্যে, তা এখন গণতান্ত্রিক ভাবে সামনে আসতে চলেছে।

আমরা আশা করবো এই নতুন পর্যায়ের মিড-ডে মিল পরিচালনা, মান এবং প্রয়োগকুশলতায় আগের অভিজ্ঞতাকেও যেমন ছাপিয়ে যাবে তেমন প্রতিনিয়ত নতুন ভাবনা তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার পথ খুলে রাখবে। যদি প্রয়োজন হয় আমরা নীতি-নির্ধারণের বিভিন্ন স্তরে আমাদের সমস্ত ভাবনার নথি প্রদর্শন করতে সদা প্রস্তুত রইলাম। আসুন স্বপ্ন দেখতে শুরু করি পুরুলিয়ার রুক্ষ প্রান্তরে একটি ছোট্ট স্কুলে রাষ্ট্রের বানানো সিলেবাস থেকে মুখ তুলে, প্রাসঙ্গিক শিক্ষার সংযোজনের মাধ্যমে, স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে নিজেদের মিড-ডে-মিলের রসদ নিজেরাই তৈরি করে নিচ্ছে পড়ুয়ারা। মিড-ডে-মিল আর একঘেয়েমিতে ভরা নয় সেখানে এসে পড়েছে নতুন স্বপ্ন এবং শ্রমে গড়ে ওঠা শস্যের উৎসব।


এই সংকলনে ঃ
- গুরুসদয় দত্ত এবং বিদ্যায়তনে ব্রতচারী অনুশীলনের গুরুত্ব
- সেই সময়, মানভুম অঞ্চলঃ হান্টারের চোখে
- বিরসা মুন্ডার গল্প শোনাই
- এক টুকরো কোলাজ, একটি অন্য রকম স্কুল
- ইভান ইলিচের ভাবনায় শিক্ষা


## বিদ্যালয় এবং পঞ্চায়েতের
# সমন্বয় এবং যৌথ উদ্যোগ

'নবদিশা' প্রথম থেকেই প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক, এমনকি বিদ্যালয় শিক্ষার উঁচু স্তর পর্যন্তও পঞ্চায়েতের তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণের কথা বলে আসছে। এরই মধ্যে ইতিবাচক শুভ পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে পুরুলিয়া জেলার একটি স্বেচ্ছা-সমন্বয়ের উদ্যোগ, যেখানে শিক্ষাদপ্তর এবং পঞ্চায়েতের যৌথ নজরদারীতে বিদ্যালয়ে 'মিড-ডে' মিলের মতো বহুনিন্দিত-বহুবন্দিত বিষয়টির তদারকি করা হবে।

বিদ্যালয় পরিচালনায় বহু গাফিলতি এবং অনিয়মের অভিযোগ পেয়ে চিরাচরিত প্রশাসনিক শীতলতা – শিথিলতার আশ্রয় না নিয়ে পুরুলিয়ার কাশীপুর পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করেছে বিশেষ দল। এই দলের মাথায় রয়েছেন কাশীপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং অন্যান্য সমস্যার যুগ্ম-সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, শিক্ষা দফতরের কাশীপুরের পরিদর্শক এবং সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ।

সমিতির সভাপতি জানিয়েছেন বিদ্যালয় পরিচালনায়, বিশেষত মিড-ডে মিলের তত্ত্বাবধানে অনেক অনিয়মের অভিযোগ আসে। এই ধরনের সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য সমন্বয়ী- উদয় – উদ্যোগ আরো সুনিবিড় করে তুলতে এই দল কাজ করবে। 'নবদিশা' চায় এই উদ্যোগ যেন আরো বিকশিত হয় এবং অন্যান্য জেলায় সৃজনশীল ভাবে সম্প্রসারিত হয়।

## সর্ব ভারতীয় শিক্ষা – মানচিত্রে
# বাংলার পরিস্থিতি উদ্বেগজনক

আবার পিছিয়ে পড়ল পশ্চিমবঙ্গ। 'District Information System for Education' (DISE) এর সমীক্ষায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সূচকের নিরিখে, বিদ্যালয় শিক্ষায় আমাদের রাজ্য এখন ৩২ নম্বর স্থানে। আমাদের পরে রয়েছে বিহার, ঝাড়খন্ড এবং উত্তরপ্রদেশ। কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের এই সমীক্ষায় সবচেয়ে উপরে রয়েছে পুদুচেরি এবং দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে লাক্ষাদ্বীপ। বড় রাজ্য গুলির মধ্যে প্রথম হয়েছে কর্ণাটক। এই সামগ্রিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শিক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে গত এক বছর প্রাথমিক পর্যায়ে ওবিসি, মুসলিম ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার কমে গিয়েছে। তবে অন্য দিকে আদিবাসী সমাজ থেকে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সূচক উর্ধ্বমুখী। মিড-ডে মিলের প্রেক্ষিতেও রাজ্য ভালো ফল করেছে। তবে পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকার ফলে পুরো পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে।

# বৃত্তি শিক্ষা নিয়ে সরকার যেভাবে ভাবছে

১২ই মার্চ ২০১৪ তে কেন্দ্রীয় সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর থেকে বৃত্তি শিক্ষা নিয়ে একটি আদেশ নামা বেরিয়েছে। নবদিশা মনে করে এটা সরকারের একটা উপযুক্ত পদক্ষেপ। এই আদেশনামায় যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে এত দিন উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তি শিক্ষা ছিল। এখন ক্লাস নাইন থেকে শুরু করা যাবে। নবদিশা মনে করে গ্রাম বাংলায় যে সমস্ত স্কুলে পরিকাঠামো আছে, সেই সমস্ত স্কুলে ক্লাস সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী থেকে যদি শুরু করা যায় তাহলে আমাদের গ্রাম বাংলার ছেলে মেয়েরা হাতে কলমে অনেক কিছু শিখতে পারবে।

# বিন্দুরা একটি জটিল সরলরেখা আঁকছে

পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত বুড়দা কালিমাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের 'পোগরডি' সংসদের একজন প্রাকৃত জনজাতিভুক্ত মেয়ে বিন্দু এবং তার আরও চারজন বান্ধবী যারা নিজেদের দারিদ্র্য – অশিক্ষা, যন্ত্রণা দিয়ে ভরে থাকা জীবনকে পাল্টে ফেলতে উদ্যোগী হয়েছে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহচর্যে। বিন্দু এখানে তার সমস্ত বান্ধবীদের একজোট করতে প্রধানতম ভূমিকা অবলম্বন করেছে। অরণ্য – পাহাড় ঘেরা এই আধা – দুর্গম গ্রামে জীবন বয়ে চলে তার নিজস্ব ছন্দে। শুধু 'মেনে নেওয়া' আর মানিয়ে নেওয়াই যেখানে জীবন হয়ে দাড়িয়েছে, সেখানে 'বিন্দু'রা নতুন একটা প্রতিরোধ যজ্ঞে সামিল হয়েছে। এলাকার কৃষি সম্ভাবনা এবং সমস্যার সুনিপুণ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের দেওয়া ওল-এর চাষ শুরু করে তাদের চোখে এখন নতুন স্বপ্নের মহাকাব্য।

এই বিন্দু'দের কাছে যখন পঞ্চায়েত গিয়ে পৌঁছেছিল তখন তারা যে নতুন কিছু শুরু করতে পারে, এই ধারণাটুকু তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করাই ছিলো সব চেয়ে জটিল এবং চ্যালেঞ্জের কাজ। বিন্দুরা এই কঠিন সংগ্রামে পেরিয়ে এসেছে অনেক গুলি বাধা এবং এই বাধা অতিক্রম করে তারা অনেক কাজের সংযুক্ত পরিকল্পনার অংশীদার হয়ে উঠেছে। বিন্দুরা এখন প্রতিদিন ওল ক্ষেতের পরিবর্তনগুলি, সমস্যাগুলি পর্যবেক্ষণ করতে শিখছে, সময় মতো তার মধ্যে কি কি করতে হবে সেগুলোও শিখছে খুব সাবধানে এবং মনোযোগ সহকারে। শুধু তাই নয় বিন্দুর মধ্যে দিয়ে পোগরডি পেতে চলেছে গ্রামোন্নয়ন এর ক্ষেত্রে এক নতুন নেতৃত্ব। আমরা গভীর ভাবে আশাবাদী বিন্দুদের আঁকা এই সরলরেখা অতিক্রম করতে পারবে অনেক জটিল এবং পতন – অভ্যুদয় – বন্ধুর পথ।

# সম্পাদকীয়

## বিদ্যালয়-স্তরে কৃষিশিক্ষা

### বাংলাদেশ পারলে আমরা কেন পারবো না ?

'নবদিশার' 'সপ্তম সংকলন' প্রকাশিত হচ্ছে। এখন সমস্ত গ্রামবাংলা জুড়ে আদিগন্ত খোলা মাঠে নেমেছে আশীর্বাদ-এর মতো বৃষ্টি। যতদূর চোখ যায় শুধু চাষের আয়োজন। এর পাশাপাশি গ্রীষ্মাবকাশের পর খুলেছে গ্রামবাংলার স্কুলগুলি। সেখানে ছেলেমেয়েরা পড়তে পড়তে অথবা লিখতে লিখতে অন্যমনস্ক হয়ে তাকাচ্ছে বৃষ্টিভেজা মাঠের দিকে-সেখানে তৈরি হচ্ছে তার পরিবারের, তার অঞ্চলের ফসল। সে দেখে প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় তার ঘরে আলোচনা চলছে, এবার কোন বীজ ? কোন সার ? সে দেখে বাড়িতে যেন আলোচনা এবার একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সে বুঝতে চায় কেন এবং কি জন্য ? তাহলে কি সবকিছু আগের মতো নেই ? শিশু মনের এসব বিড়ম্বনা তাকে পাঠে মনোযোগ দিতে দেয় না।

'নবদিশা' চায় এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হোক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের মধ্যেই। যদি বাংলাদেশ ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত কৃষিশিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে পারে, এবং নতুন প্রজন্মের সামনে কৃষিকে গ্রহণীয় পেশা হিসেবে তুলে ধরতে পারে, তবে আমরা কেন পারব না ? শুধু মাত্র নতুন মধ্যবিত্ত, যারা ডিজিটাল ভারত দেখতে চায়, তাদের প্রতিক্রিয়ার ভয়ে আমরা পিছিয়ে যাবো ? নবদিশা মনে করে, না - কখনো নয়। বাংলাদেশ বিদ্যালয়স্তরে কৃষিশিক্ষাকে দেখেছে সুস্থায়ী উন্নয়নের প্রেক্ষিতে। তারা মনে করে বিদ্যালয়স্তরে কৃষিশিক্ষা জরুরী কারণ এর মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠতে পারে কৃষিমনস্ক একটি নতুন নাগরিক সমাজ। যারা সচেতন থাকবে দেশের শস্য, মাছ, অরণ্য এবং জৈব বৈচিত্র্যের অন্যান্য দিকগুলি সম্পর্কে। সময় এসেছে নতুন করে বিদ্যালয় পাঠক্রমকে ভাবার, যেখানে প্রতিফলিত হবে কৃষি এবং সংযুক্ত ক্ষেত্র। ছেলেমেয়েরা জানবে চাষ শুধু বিকল্পহীনতার আশ্রয় নয়। বরঞ্চ হতে পারে অন্যতম লাভজনক পেশা এবং শুধু তাই নয়, এই পাঠক্রমে আমরা চাই প্রতিফলিত হোক সুস্থায়ী কৃষির পদ্ধতি প্রকরণ। উঠে আসুক পশুপালনের সমস্যা সম্ভাবনা, সবজি – বাগানের নতুন প্রণালী, মাছ চাষের বিজ্ঞান।

আমরা মনে করি সারা বাংলায় এই পাঠক্রম পরিকল্পিত ভাবে লাগু করা হোক। যদি মনে হয় প্রথমে ঐচ্ছিক হিসাবে আনা উচিত, তবে তাই হোক। কারণ ভারতবর্ষ গ্রামে বাস করে। আর গ্রামের আবাস কৃষি। 'নবদিশার' এক শান্ত বিপ্লবের অপেক্ষায় রইলো।

## গ্রামীণ শিক্ষাঙ্গনে ব্রতচারী অনুশীলনের গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা

এমন একটি সময় যা আমাদের প্রতিদিন মানবিক মূল্যবোধ গুলি ভুলিয়ে দিয়ে এক জান্তব পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিতে উদ্যত। এ এক এমন পরিস্থিতি যেখানে আমরা সৃজন আর সৃজনশীলতার সাধারণ বোধগুলি হারিয়ে নরকতুল্য এক জীবন পরিস্থিতি মান্য করে নিয়েছি। এরকম একটা জটিল পরিস্থিতিতে আমরা যদি ইতিবাচক ঐতিহ্যের কাছে ফিরে যেতে না পারি যদি না তুলে ধরতে পারি, ঐতিহ্যের মানবিক সারবস্তুগুলি তবে আমাদের চোখের সামনে নতুন প্রজন্ম এক চূড়ান্ত অবক্ষয়ী আধুনিকতার শিকার হয়ে যাবে।

'নবদিশা' ভাবনা প্রতিটি মানবিক ঐতিহ্য যেহেতু বিচার করতে এবং তার সম্প্রসারণ করতে আগ্রহী সেই হেতু বিদ্যায়তনে গুরুসদয় দত্ত'র ব্রতচারী ভাবনার পুনরায় প্রবর্তিত করা আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী। প্রশ্ন হলো আমরা কেন এর প্রবর্তন চাইছি।

আমরা মনে করি 'ব্রতচারী' ভাবনার মধ্য দিয়ে গুরুসদয় তুলে ধরতে চেয়েছিলেন শ্রম এবং ব্রতী জীবনের গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা।

আজ এই ব্রতচারী ভাবনা এবং অনুশীলনের মধ্য দিয়ে আমরা যদি বিদ্যায়তনে সুস্থ সংস্কৃতির সম্প্রসারণ ঘটাতে পারি, তবে তাই হবে অবক্ষয় প্রতিরোধের প্রাথমিক সোপান। গুরুসদয় তার 'গ্রামের ডাক'-পত্রিকার মধ্য দিয়ে সেদিন দেশের কাছে তুলে ধরে ছিলেন শ্রম এবং সৃজনী অধ্যবসায়ের গুরুত্ব। এই সৃজনের মধ্য দিয়ে তিনি তুলে এনেছিলেন এক অনন্ত প্রাণশক্তির সম্ভাবনা। গান-আবৃত্তি এবং শারীরিক অনুশীলনের সমন্বয়ে তিনি বার্তা দিতে চেয়েছিলেন যে সময় এসেছে তথাকথিত মানের বালাই ছিন্ন করে কোদাল তুলে ধরার।

আজ যদি গ্রামের বিদ্যায়তনে এর সম্প্রসারণ ঘটাতে পারি তবে নবীন পড়ুয়াদের মধ্যে সৃষ্টি হবে প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং শ্রমকে ভাবার ও অনুশীলনের বৌদ্ধিক তেজস্ক্রিয়তা।

> কারখানার দক্ষতা শিক্ষা নয়; স্কুল কলেজে পরীক্ষায় পাশ করা নয়; আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে, প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।
>
> - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## গুরুসদয় দত্ত

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের আই. সি. এস. অফিসার গুরুসদয় দত্ত। এক দিকে তাঁর স্বাধীনচেতা মন, প্রখর দেশাত্মবোধ, অথচ চাকরি করেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের অধীনে। একদিকে উচ্চপদস্থ আধিকারিক, অন্যদিকে এক দৃঢ়চেতা সমাজকর্মী। কী করে মেটাতেন এই দুই মেরুর বৈপরীত্য ? ১৯২৮ সালে হাওড়ার বামনগাছিতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জমায়েত হয়েছিল একদল মানুষ। অ-হিংস জমায়েত। থানার ব্রিটিশ অফিসার গুলি চালানোর নির্দেশ দিলেন। স্বাধীনতার ইতিহাসে এই বামনগাছি ফায়ারিং কেস সুবিদিত। গুরুসদয় দত্ত সেই সময় হাওড়ায় দায়িত্বে আছেন। জেলার উচ্চপদস্থ অফিসার তিনি। ওই ব্রিটিশ

> **১৯২৮ সালে হাওড়ার বামনগাছিতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জমায়েত হয়েছিল একদল মানুষ। অ-হিংস জমায়েত। থানার ব্রিটিশ অফিসার গুলি চালানোর নির্দেশ দিলেন। স্বাধীনতার ইতিহাসে এই বামনগাছি ফায়ারিং কেস সুবিদিত।**

অফিসারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। ইংল্যান্ডের হাউস অফ লর্ডসে এই নিয়ে ঝড় উঠল। "কি! বাঙালি আই. সি. এস. অফিসারের সাহস ব্রিটিশ পুলিশকে প্রশ্ন করা!" গুরুসদয় দত্ত বদলি হলেন ময়মনসিংহ জেলায়। এখানেও উচ্চপদে আসীন হলেন। কিছু দিন যেতে না যেতেই শুরু হলো গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলন – লবণ আইনের বিরুদ্ধে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ গুরুসদয় দত্তকে আদেশ দিলেন আন্দোলন স্তব্ধ করতে। গুরুসদয় দত্ত হাত গুটিয়ে থাকলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিরুদ্ধে কোনও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া গ্রহণ করলেন না। টেলিগ্রামে নির্দেশ এলো গুরুসদয় দত্তকে বীরভূমে বদলি করা হয়েছে। টেলিগ্রামের সাহায্য রাতারাতি আই. সি. এস. অফিসারকে বদলি করার নির্দেশ অভাবনীয়। উচ্চপদস্থ আধিকারিক অথচ প্রায়ই দেখা যায় সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে মাঠে, ঘাটে, পানা পুকুরে নেমে কাজ করছেন। হাতে কোদাল, বেলচা, ঝাঁটা। অবিভক্ত বাঙলার যে জেলায় চাকরিসূত্রে গেছেন, তৈরি করেছেন কর্মীদল । যারা প্রয়োজনে খরা, বন্যাত্রাণে এগিয়ে এসেছেন। যেখানেই জেলা শাসক হিসাবে কাজ করেছেন, সেখানে গ্রাম উন্নয়ন আর সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের সূচনা করেছেন। মেয়েদের পর্দানসীন অবস্থার গ্লানি মন-প্রাণ দিয়ে অনুভব করতেন। স্ত্রী সরোজ নলিনী দত্তের সঙ্গে পাবনা জেলায় তৈরি করেছিলেন মহিলা সমিতি। নারীমুক্তি ছিল মহিলা সমিতিগুলির কাজের ভিত্তি। পরে ওনার স্ত্রী মারা গেলে গুরুসদয় দত্ত স্ত্রীর স্মৃতিতে তৈরি করেন একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেখানে মেয়েদের জন্য হাতের কাজ ও প্রথাবহির্ভূত উপায়ে পড়াশোনা শেখানো শুরু হয়। লোক জীবন নিয়ে পড়াশোনা করা, কাজ করা ছিল গুরুসদয় দত্তের প্রাণের বিষয়। বই লিখেছেন-লোক গান, লোক নৃত্য নিয়ে। লোক শিল্পের নানান নিদর্শন, হাতের কাজ, ছবি, পট, পাথর খোদা মূর্ত্তি, কাঠের কাজের জিনিস, পুতুল, এমন কি বাঙলার মিষ্টি সন্দেশের ছাঁচ জোগাড় করা ছিল তাঁর নেশা। অবিভক্ত বাঙলার

> **যেখানেই জেলা শাসক হিসাবে কাজ করেছেন, সেখানে গ্রাম উন্নয়ন আর সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের সূচনা করেছেন। মেয়েদের পর্দানসীন অবস্থার গ্লানি মন-প্রাণ দিয়ে অনুভব করতেন।**

রায়বেঁশে নৃত্যকলাটি পুনরুদ্ধার করেন তিনি। এই বিশেষ ধরনের নাচটির ইতিহাস – ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা করেন, এছাড়াও, ঢালি নাচ, কাঠি নৃত্য, ধামালি – ঝুমুর – ব্রত প্রভৃতি লোকনৃত্যের ধরণগুলিকে পুনরুদ্ধার করেন। সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। তাঁরা যাতে তাদের শিল্পকলাগুলি চর্চা করার সুযোগ পান তার ব্যবস্থা করেন। গ্রামের মানুষেরা যাতে তাঁদের একান্ত নিজস্ব সংস্কৃতি – হাতের – কাজ, শিল্পকলার চর্চা করতে পারেন সেই বিষয়ে তিনি আমরণ প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন, উৎসাহিত করে গেছেন। এই ভাবনার সূত্র ধরে ১৯৩১ এ তৈরি করেন "বঙ্গীয় পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি"। ১৯৩৮ এ এই সমিতি বাঙলার ব্রতচারী সোসাইটি নাম নেয়। ১৯৩৬ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে মুখপত্র হিসাবে একটি পত্রিকা। আসলে ১৯৩২ সাল থেকেই গুরুসদয় দত্ত বাঙলার গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে শুরু করে ছিলেন ব্রতচারী আন্দোলনের বীজ। এই আন্দোলনের মূলমন্ত্র হলো জীবনকে পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশিত করা। আধুনিক জীবন যেন বিচ্ছিন্ন কয়েকটি খোপে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। শিক্ষা, কাজ, খেলাধূলা, দৈনন্দিন জীবন যাপনের নানান দিকগুলো যেন সম্পর্কহীন, বিখন্ডিত। গুরুসদয় দত্ত তাঁর ব্রতচারী আন্দোলনের মাধ্যমে চাইলেন ব্যক্তি জীবনে সমন্বয় আনতে। ব্যক্তির মন ও শরীরের মধ্যে মিল ঘটাতে। মনের বিকাশ আর শরীর গঠন তাল মিলিয়ে চলবে। লোকনৃত্য এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। লোকগান ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিকে মেলাবে। জীবনধারণকারী

> **অবিভক্ত বাঙলার রায়বেঁশে নৃত্য কলাটি পুনরুদ্ধার করেন তিনি। এই বিশেষ ধরনের নাচটির ইতিহাস – ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা করেন, এছাড়াও, ঢালি নাচ, কাঠি নৃত্য, ধামালি – ঝুমুর – ব্রত প্রভৃতি লোক নাচের ধরণগুলিকে পুনরুদ্ধার করেন।**

পাঁচটি ব্রতঃ- জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য আর আনন্দের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ব্যক্তি জীবন প্রভাব ফেলবে তাঁর নিজ গোষ্ঠীতে, সমাজে। গোষ্ঠী, গ্রাম, শহর, সমাজ ছাপিয়ে ঐক্য, মৈত্রী সমন্বয়ের এই প্রভাব ছড়িয়ে যাবে দেশে, দেশে। বিশ্ব জুড়ে। বিবিধের মাঝে জীবনের মহামিলন ছড়িয়ে পড়বে। ১৯৪১ সালে কলকাতা সংলগ্ন জোকা অঞ্চলে তৈরি হয় ব্রতচারী গ্রাম ও ব্রতচারী জনশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সাধারণ গ্রাম্য মানুষের নিজস্ব শিল্পকলা, সংস্কৃতি – নাচ – গান – এর চর্চার হাত ধরে সুস্থ মন ও সু-স্বাস্থ্য গঠনের প্রাণকেন্দ্র।

> **১৯৩২ সাল থেকেই গুরুসদয় দত্ত বাঙলার গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে শুরু করে ছিলেন ব্রতচারী আন্দোলনের বীজ। এই আন্দোলনের মূলমন্ত্র জীবনকে পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশিত করা।**

লোকশিল্পের সম্পদ ও সৌন্দর্য নিয়ে তাঁর নানা লেখা প্রকাশিত হয়েছিল তখনকার দিনে নানান পত্রিকায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে আর বেঙ্গল ব্রতচারী সোসাইটির লাইব্রেরীতে সেগুলি রাখা হয়েছে।

"চল কোদাল চালাই  
ফেলে মানের বালাই  
ঝেড়ে অলস মেজাজ  
হবে শরীর ঝালাই।"

কায়িক পরিশ্রমের মান নিয়ে প্রচুর রচনা লিখি আমরা, বক্তৃতা শুনি। পণ্ডিত প্রবর গুরুসদয় দত্ত হাতে – কলমে কাজ করে তার সত্যতা দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন – আমৃত্যু।

## নবদিশার ভাবনা

- গ্রাম বাংলার শিক্ষাঙ্গনে প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি আঞ্চলিক জীবনযাপন-নির্ভর শিক্ষার সংযোজিত প্রচেষ্টা।
- আঞ্চলিক জ্ঞান ও সংস্কৃতিই হবে সংযোজিত শিক্ষার মূল ভিত্তি।
- এর বাস্তব রূপায়ণে সাধারণ মানুষের স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসিত সরকার একটা উল্লেখযোগ্য অবদানের দিশারী হবে।

# আর কোনও দিন আলপথ ধরে হাঁটবেন না শাশ্বতী মিত্র

গত ৩০শে (২০১৪) এপ্রিলের মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনার দিন সকালেও তিনি চিন্তিত ছিলেন সমাগত গ্রীষ্মের দাবদাহে রাঢ় বাঙলার প্রান্তিক মানুষের যন্ত্রণা নিয়ে ... তিনি শাশ্বতী মিত্র। সহকর্মীদের আনন্দ-রাগ-দুঃখ-যন্ত্রণার প্রতি তিনি ছিলেন সদামনোযোগী। প্রতি সন্ধ্যায় দূর-দুরান্তের গ্রামে কর্মরত অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌ অথবা সহযোগী সংস্থার কর্মীদের মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে ভেসে উঠতো তাঁর নম্বর। তাঁর, ভালোবাসা-ভরা ধমকের অনুপ্রেরণায় হতাশ কর্মীরাও যেন প্রাণ ফিরে পেতেন।

বিগত শতাব্দীর আশির দশকের মধ্য ভাগে যখন অধুনা বিস্মৃত 'উন্নয়ন' নামক সংস্থায় পেশাজীবি হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন শ্রীমতি মিত্র, তখনও এন জি ও বিশেষ সেক্টর হিসেবে পরিচিত হয়নি। নিজেকে মানবতার দর্শনে মতাদর্শগত ভাবে প্রস্তুত করে তোলার জন্য নিজেকে কখনই স্ব-আরোপিত ঘেরাটোপে আবদ্ধ রাখেননি শাশ্বতী। ৯০ দশকের শুরুতে নারী আন্দোলনের সংস্থা 'স্বয়ম' সৃষ্টি হলে সেখানে পেশাজীবি হিসেবে যোগদান করেন তিনি, যা তাঁকে দিয়ে ছিল দরিদ্র-নিপীড়িত নারীর নিজস্ব ভুবনের অভিজ্ঞতা। অসাধারণ-দায়িত্ববোধ, মানবতার দর্শনে দায়বদ্ধতা এবং নিখুঁত পেশাদারীত্ব এই তিনের সমন্বয়ে সংস্থা এবং সংস্থার বাইরেও তিনি হয়ে উঠেছিলেন সকলের প্রিয়। তাই বলে তিনি কখনোই অন্যায় আপোষ করে সকলের 'প্রিয়' হয়ে ওঠার চেষ্টা করেননি। ২০১৩ সালের জানুয়ারী মাসে যখন অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌ এর শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচীতে পেশাজীবি হিসেবে কাজ করতে শুরু করেন শাশ্বতী, তখন তিনি আদ্যন্ত পেশাদার অথচ র‍্যাডিকাল মানবতার মূলসূত্রগুলি প্রতিদিন প্রয়োগ করে চলেছেন গ্রামের বিদ্যালয়ে অথবা পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠানে। তিনি যখন শিশু কিশোরদের সাথে কথা বলতেন, তার কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়ত আবেগ, ভালোবাসার মণিমুক্তো। যখন শিক্ষকদের সাথে সংলাপ চালাতেন ধরা পড়তো ভিন্ন পেশার প্রতি তার শ্রদ্ধা এবং গুরুত্ববোধ। তিনি যখন পঞ্চায়েতে কথা বলতেন তার কথায় ভেসে উঠতো গ্রামের স্বায়ত্বশাসনের লড়াই এর প্রকৃত বন্ধুর ভাবমূর্ত্তি।

প্রথমে পুরুলিয়া এবং পরে দক্ষিণ দিনাজপুরের গ্রামীণ-শিক্ষাঙ্গনে তিনি প্রাসঙ্গিক শিক্ষা প্রকল্পের ভাবধারার সম্প্রসারণে নিজের অনির্বাণ মৌলিকত্বের ছাপ রেখেছিলেন। আমরা দেখেছিলাম তাঁর গ্রামীণ জীবনের সাথে নিজেকে মিলিয়ে নেওয়ার অদম্য সাহসিকতা এবং আবেগ। মাঠ-স্তরের কর্মীদের সাথে তিনি নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন বন্ধুর মতো---- সহকর্মীর মতো---- দিদির মতো---- ভাবনা সহযোগীর মতো।

শুধুমাত্র গ্রামন্নোয়নের অথবা গ্রাম পুনর্গঠনের প্রতিদিনের 'প্রথাসিদ্ধ' কাজের মধ্যেই নয়, তিনি নিজেকে সুনিবিড় ভাবে অঙ্গীভূত করে নিয়ে ছিলেন 'নবদিশা' র প্রকাশনা ব্যবস্থার সাথেও। লেখা, লেখা নির্বাচন, প্রুফ সংশোধনের মতো আপাত-সরল অথচ জটিল কাজগুলি তাঁকে বাদ দিয়ে আমরা ভাবতেই পারতাম না-আর পারতাম না বলেই আজ এই সংখ্যায় আমরা প্রতিপলে তার স্মৃতিমুখরতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছি, শুধু মুদ্রণের প্রক্রিয়াতেই নয়, আমরা দেখেছিলাম 'নবদিশা' র প্রচার প্রসারে তাঁর আবেগ ছিলো কত তীব্র অথচ যুক্তি প্রাণস্পন্দনে ভরা। তিনি আমাদের শিখিয়ে ছিলেন গ্রামের মানুষকে যদি ভালো বই, ভালো পত্রিকা পড়ার জন্য উৎসাহিত করে তোলা না যায়, তবে এই ধরণের পত্রিকার প্রচার এবং প্রসারে প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করা সম্ভব হবে না। সেজন্য গ্রামের শিক্ষকদের তিনি হাতে তুলে দিয়ে ছিলেন 'তোত্তো-চান এর মতো বই।

আমরা দেখেছি তাঁর নিরন্তর নতুন পরীক্ষা প্রবণতা, তাঁর মেধার আলোকে আলোকিত হয়েছি আমরাও---- যে পথ চলাতেই তিনি আনন্দ খুঁজে নিয়ে ছিলেন সেই পথ-ই তাকে গ্রাস করলো। ৩০ শে এপ্রিল বালুরঘাটের রাজপথে এক পথ দূর্ঘটনার পর ৪ঠা মে ২০১৪ মালদহের এক হাসপাতালে তীব্র যন্ত্রণাময় লড়াইয়ের শেষে চলে গেলেন শাশ্বতীদি। আমরা জানি জীবিতের শোক মৃত গ্রহণ করে না, তাই শোক পরিণত হোক শপথে, কারণ সব মরণ নয় সমান।

# মূর্ত হয়ে উঠছে গ্রাম জীবনের অনুষঙ্গ

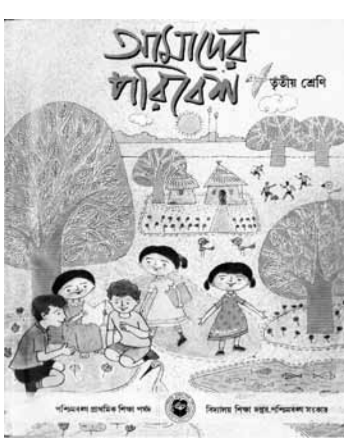


পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর – দ্বারা প্রকাশিত তৃতীয় শ্রেণীর "আমাদের পরিবেশ" বইটি শিশুদের পরিবেশ – প্রকৃতি – আবাস ইত্যাদি সংক্রান্ত জ্ঞানের প্রাথমিক সোপান হিসেবে অসাধারণত্বের দাবী করতে পারে। সারা বইতে প্রচুর গভীর এবং জরুরী কথা খুব সহজে বলা হয়েছে। এই সহজ ছন্দের জন্য বইতে সংলাপের মধ্য দিয়ে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। শিশু মনে নিসর্গের প্রভাব খুব বেশী। একটি করতলগত বীজের শক্ত আভরণে কিভাবে লুকিয়ে থাকে মহাবৃক্ষ, তা শিশুর কাছে এক চরম বিস্ময়ের ব্যাপার। শিক্ষা, বিশেষত 'পরিবেশ শিক্ষা'র প্রধান উদ্দেশ্য হল শিশু বিস্ময়াভূত অনুসন্ধানের শরিক হয়ে ওঠা।

এই বইতে শিশুর স্বাভাবিক আবাসের উপাদানগুলি আলোচনা করা হয়েছে তার ভালো লাগবে এমন এক ভাষায়। শিশু, অর্থাৎ যে পড়ুয়া, সে যে এই মহান প্রকৃতি এবং তার অনন্ত বিশালতার অংশ তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রতিটি অধ্যায়। শিশু-পড়ুয়ার নিজস্ব ভুবনের পরিব্যাপ্তি এবং গভীরতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এমন ভাবে পাঠ্যাংশ নির্মাণ করা হয়েছে যে 'সক্রিয় শিক্ষার্থী' হয়ে ওঠার পথ খোলা থাকছে।

শরীর, খাদ্য, পোশাক, ঘরবাড়ি, পরিবার, আকাশ, সম্পদ, সাবধানতা ইত্যাদি বিষয়ে শিশুর পরিবেশ চেতনার কোমল স্নায়ুতে স্পন্দন আনতে চেয়ে পুস্তক নির্মাতারা মানবসভ্যতা, বিশেষত ভারতীয় সভ্যতার প্রধান মর্মবাণী ধারণ করে আছে যে গ্রাম এবং এই গ্রামের সুস্থায়ী, সুসমন্বিত উন্নয়নের মধ্যেই যে বসুন্ধরার জীবনসুষমা, এই সহজ অথচ জটিল সত্য'টি এই বইতে বুনে দেওয়া হয়েছে নিপুণ দক্ষতার মধ্য দিয়ে। এই বই এর কর্মপত্র গুলির মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে এমন এক ধরণের সক্রিয়তার বাতাবরণ যেখানে শিশুর মেধা-বোধ-দক্ষতার সমন্বিত বিকাশের পরিসর সৃষ্টি হতে পারে। প্রতিটি অধ্যায় গ্রামের বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যখন পাঠ করাবেন তখন তাঁদের সুযোগ থাকছে বদ্ধ শ্রেণী কক্ষের বাইরে যে অনন্ত প্রকৃতি তার বিপুল ঐশ্বর্য নিয়ে উপস্থিত, তার সাথে শিশুর মেলবন্ধন ঘটিয়ে দেওয়া। এই বই আসলে শিক্ষকের সাথে শিশু-পড়ুয়ার নতুন সম্পর্কের রসায়ন সৃষ্টি করার পথ সূচনা হতে পারে। এই পথের মধ্যে তিনি, অর্থাৎ শিক্ষক, কিভাবে তার পড়ুয়াদের নিয়ে যাবেন এবং কতটা সৃজনশীল হবে তার এই পথ দেখানো ও সঞ্চালকের ভূমিকা তাঁর ওপরে এই বই এর বাস্তব সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করছে। বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামে শিক্ষক মহাশয় যখন এই বই পড়াবেন তখন তাঁকে চ্যালেঞ্জ নিতে হবে 'প্রথাসিদ্ধ' শিখন – পরামর্শকে অতিক্রম করে যাওয়ার, আমরা অপেক্ষায় রইলাম।

# 'অসফল' বিদ্যালয়-ছুট থেকে 'উদ্যোগী' শিক্ষানবিশ

প্রচলিত রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয় পাঠক্রম যখন ক্রমশ জীবন এবং পরিপ্রেক্ষিত বিচ্ছিন্ন হয়ে নীরস এবং অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে, তখন সৃজনের নতুন দিগন্ত খুলে দিতে 'নবদিশা'র সুনিবিড় ভাবনা এবং পঞ্চায়েতের উদ্যোগের এলাকাগুলিতে শান্ত-পরিবর্তনের প্রস্তুতি নিচ্ছে একদল বিদ্যালয়-ছুট কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী। 'নবদিশা' মনে করে প্রতিটি মানুষের মধ্যে রয়েছে শিক্ষিত এবং কুশলী হয়ে ওঠার অযুত সম্ভাবনা। তাই আমরা মনে করি না বিদ্যালয়ে নেই মানেই সে শিক্ষার বৃত্তে নেই। আমরা মনে করি আজ যে ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা নিয়ে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ থেকে বাইরে বসে আছে, সেই হতে পারে নতুন কোনো কৃষি পদ্ধতির দূত। যা সেই গ্রামের কৃষি উৎপাদনে নিয়ে আসতে পারে গুণগত রূপান্তর। আজ যে অলস সময় যাপনে ব্যাপৃত, সেই হতে পারে গ্রামের 'রোল মডেল'। ভারতের তথা পশ্চিমবাংলার গ্রামীণ আয়ের সিংহভাগ এখনো আসে কৃষির মাধ্যমে। সে জন্য আমরা মনে করি যদি গ্রামীণ কৃষি উৎপাদনে নতুন নতুন উপাদান সংযোজিত করতে হয়, যদি হতাশ কৃষক সমাজের সামনে 'কৃষি কি ভাবে লাভজনক হতে পারে' এই বিড়ম্বিত-প্রশ্নের সদুত্তর রাখতে হয়, তবে, এই সব 'বিদ্যালয়-ছুট' দের মধ্য থেকে আমাদের খুঁজে নিতে হবে নতুন প্রজন্মের কৃষি-উদ্যোগী। এখানে কৃষি উদ্যোগ বলতে আমরা বোঝাতে চেয়েছি উদ্যান পালন, মৎস্যচাষ, কৃষি বনপালন এবং গ্রামস্তরে মূল্য সংযোজিত করে বিপণন হতে পারে এমন সমস্ত কৃষি বাণিজ্যের উদ্যোগ গুলিকেও। এই সমস্ত 'বিদ্যালয়-ছুট' দের সুনিপুণ ভাবে প্রশিক্ষিত করা হবে কৃষি এবং সংযুক্ত ক্ষেত্রের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য এবং এখানে খেয়াল রাখা হবে সেইসব বিশেষ দিকগুলিক ওপরে যা তার গ্রামে বা অঞ্চলে নেই, যেমন ধরা যাক অ্যাজোলা চাষ। পশুখাদ্য হিসাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ এই জলজ ফার্ণটির চাষ পদ্ধতি যদি কোনো 'বিদ্যালয়-ছুট' শিখে নেন, তবে তার গ্রামের অন্যান্য অনেকেই এটি 'আপন' করে নিতে

পারেন। আবার ধরা যাক 'কেঁচো সার' এর চাষ। সুস্থায়ী কৃষির সম্প্রসারণের সবচেয়ে জরুরী উপাদান। যে গ্রামে এই 'সার' অমিল অথবা প্রাপ্য হলেও তার গুণমান নিয়ে অনেক প্রশ্ন-সন্দেহ আছে, সেখানে যদি কয়েকজন 'বিদ্যালয়-ছুট' এই সার-উৎপাদনে দক্ষতা দেখাতে পারে তবে সেই গ্রামে সুস্থায়ী-কৃষি নতুন প্রাণবায়ু পাবে। বাংলার মাটিতে অনেক পুষ্টি প্রদানকারী ফল রয়েছে যেগুলির ভালো চারা স্থানীয় ভাবে পাওয়া যায় না। আম, লিচু, সবেদা, লেবু ইত্যাদি সুপরিচিত ফলের গুণগত মান সমৃদ্ধ চারা আমাদের 'বাইরে' থেকে আনতে হয়। 'বিদ্যালয়-ছুট'দের মধ্যে নার্সারী-উদ্যোগ নেওয়ার ওপরে তাই সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। ফলের নার্সারী, কাঠের গাছের নার্সারী, সবজি নার্সারী এমনকি ফুলের নার্সারী যদি 'বিদ্যালয়-ছুট'রা লাভজনক ভাবে করতে পারেন, তবে তা গ্রামের ভালো চারা'র চাহিদা যেমন মেটাবে তেমন আরো পাঁচজন এতে উৎসাহ পাবেন। পশুপালনের ক্ষেত্রেও এরকম উদ্যোগ খুব বাঞ্ছনীয়। যেমন ধরা যেতে পারে বহু-প্রসবী গারল ভেড়া। যদি কোনো 'বিদ্যালয়-ছুট' এর পালন এবং সংখ্যা বৃদ্ধিতে সফল হন, হয়তো সেখান থেকেই অন্যান্য জায়গার জন্য যোগাযোগকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে তার ফার্ম, কিন্তু সর্বোপরি খেয়াল রাখতে হবে এসবই ঘটতে হবে স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান এবং প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধানে। 'নবদিশা'-ভাবনায় এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগের এলাকাগুলিতে বহু সীমাবদ্ধতা নিয়ে সামনে এসেছে পঞ্চায়েত। বহু জায়গায় পঞ্চায়েত প্রতিনিয়ত তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রলম্বিত করেছেন এইসব 'বিদ্যালয়-ছুট'দের জন্য। যদিও সবসময় আইনী – নিগড় তাঁদের পুরোপুরি একাজে নামতে দিচ্ছে না একথা সত্য, তবু সীমাবদ্ধতাকে ভাঙ্গার যে ইতিবাচক মানসিকতা যেভাবে তাঁরা দেখাচ্ছেন, তা আগামী দিনে আলোচ্য সন্দর্ভ হয়ে উঠতে পারে। নিছক একটি 'স্কিমে'র সম্প্রসারিত রূপ হিসাবে না দেখে পঞ্চায়েত যদি গ্রামে গ্রামে এই ধরনের উদ্যোগী তৈরি করতে পারে তবে তা হবে গ্রামোন্নয়নে প্রকৃত 'নবদিশা'।

# সেই সময়

উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান স্কটিশ ইতিহাসবিদ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডব্লু.ডব্লু. হান্টার বৃহত্তর বাঙলার বিভিন্ন প্রদেশের যে অনুপুঙ্খ ইতিহাস লিখেছিলেন তার মধ্য থেকে একটি বিশেষ অঞ্চলের ইতিহাস-অংশটি বেছে নিয়ে তার প্রধান দিকগুলি তুলে ধরা হলো। আমরা আশা করবো গ্রামীণ-বাংলার শিক্ষাঙ্গনে যে সমস্ত শিক্ষকরা ইতিহাস পড়াচ্ছেন তারা এই রচনাংশ থেকে সমৃদ্ধ হবেন এবং এর তথ্য ও বিশ্লেষণ পড়ুয়াদের নিজেদের মতো করে তুলে ধরবেন।

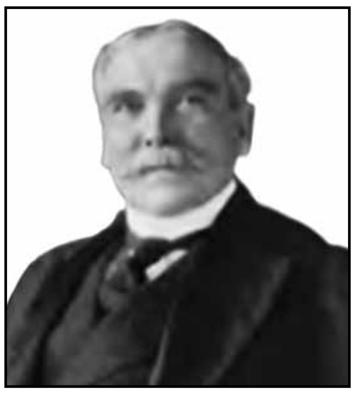

## মানভূম অঞ্চল

### প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

ছোটনাগপুর মালভূমি ঢাল নেমে যাচ্ছে ধাপে ধাপে দক্ষিণ বাংলা ধরে। ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্ব দিকের প্রথম উতরাই হল মানভূম অঞ্চল।

লাল মাটির দেশ। ছোট ছোট পাহাড় আর টিলায় ভরা দেশ। সমতল নয়, জমিই যেন ঢেউ হয়ে উঠছে, পড়ছে। লাল মাটি – শক্ত, শুকনো, কাঁকড়ে, ভরা। গ্রীষ্মে তপ্ত দিনে শুকনো লাল মাটি আর গাছহীন প্রান্তর জ্বলে পুড়ে যায়, বিষন্ন দেখায়। আবার বর্ষার দিনে ওই একই জমি কচি ধান গাছে সবুজ হয়ে ওঠে। ছোট ছোট সবুজ বনবাদাড়ে লাল মাটির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে উদ্যানের ছবি তৈরি করে। মানভূম অঞ্চলের দক্ষিণ আর পশ্চিম দিক দুটি আরো মনোরম। একেবারে ছবির মতো মানভূম অঞ্চলের উত্তর আর উত্তর – পূর্ব ধার দিয়ে বয়ে চলে বরাকর আর দামোদর নদ। পশ্চিম আর দক্ষিণ দিয়ে বয়ে যায় সুবর্ণরেখা এছাড়াও, দ্বারকেশ্বর, সিলাই আর কাঁসাই নদী এই জেলাকে ছুঁয়ে যায়। মানভূম অঞ্চলের পরে তিনটি পর্বত শ্রেণীঃ- দলমা পাহাড়, পাঁচকোট বা পাঞ্চেৎ আর বাঘমুন্ডির পর্বতের গঙ্গাবারি বা গাজবরু শিখর। পাহাড়গুলি ঘন জঙ্গলে ভরা। মানভূমে কোন জলাভূমি নেই। নেই কোন প্রকৃতির তৈরি করা সরোবর। যদিও তিনটে বড় বড় সরোবর রয়েছে, যেগুলি মানুষের তৈরি করাঃ- পুরুলিয়া সদরের সাহিব বাঁধ, জয়পুরের রানিবাঁধ আর পাঁদরার পোদারধি বাঁধ। মানভূম অঞ্চলের জলবাহিত যানবাহনের চল নেই। যদিও কাঁসাই আর দামোদর ধরে কাঠ বোঝাই নৌকা চলে। যদিও দামোদর নদের বন্যার মেজাজকে মানুষ ভয় পায়। বর্ষাকালে কয়লা কোম্পানিগুলি কয়লা বোঝাই নৌকা পাঠিয়ে দেয় দামোদর ধরে হুগলী নদীর ধারে কয়লা ডিপোগুলির দিকে। ঝরিয়া অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায়। এছাড়াও মানভূম অঞ্চলে লোহা মেলে। আর পাওয়া যায় সাজি সাজি মাটির খনি খাত থেকে, সাজি সাজি মাটির খন্ড খুঁড়ে আনা হয় আর তাই দিয়ে তৈরি করা হয় থালা, বাটি, শিব লিঙ্গ। তৈরি হওয়া জিনিস চলে যায় বর্ধমান আর কলকাতার বাজারে। মানভূম অঞ্চলের বনজঙ্গল সরকারের অধিকারে নেই। সব বনই ব্যক্তিগত জমিদারদের দখলে। কাঠ ব্যবসা করে মহাজনেরা। শাল গাছের বন সাবাড় হয়ে গেল শাল কাঠ কেটে রেলে পটরি তৈরি করতে গিয়ে। মানভূম জুড়ে পড়ে থাকে নিষ্ফলা, অনুর্বর জমি। উৎকৃষ্ট এলাকার জমি তাই উৎকৃষ্ট চারণভূমি। ধান কাটার পর গরু ছাগলের পাল ছেড়ে দেওয়া হয় চরার জন্য। সারা বছরই মাঠের ঘাস থাকে রুখা-শুখা। জি টি রোডের ধারের চারণভূমিতে গরু-ছাগল চরানোর জন্য চাষিদের কাছ থেকে সরকার কর আদায় করে।

### জাতিগত বিন্যাস

মানভূম অঞ্চলে মূলতঃ আদিবাসী জনজাতি গোষ্ঠীর বসবাস। প্রাচীন কালে এই অঞ্চল তাদেরই ছিল। আর্য জাতির আগমনে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আদিবাসীরা যেমন কোণঠাসা হয় যায় তেমনি মানভূম অঞ্চলের আদিবাসীরাও সরতে সরতে নিষ্ফলা, বন্ধ্যা অংশে সরে যায়। তাছাড়া আর্য-হিন্দুরা জনজাতি গোষ্ঠী-যুক্ত মানুষদের মিথ্যা উপাধি দিয়ে হিন্দু সমাজে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়। এই ভাবে মূল ভূমিতে জনজাতি গোষ্ঠীর সংখ্যা কমতে শুরু করে। তাও মানভূম জুড়ে আদিবাসীরা তাদের আধিপত্য ধরে রাখতে পেরেছে। তার কারণ বন কাটা পড়লেও এখন এই জেলা জুড়ে ঘন জঙ্গল রয়েছে। এখানকার মাটি সাধারণ চাষাবাদের জন্য তেমন উপযুক্ত নয়। আদিবাসী জনজাতির মানুষজন বনজ ফলমূল খেয়ে দিন কাটায় আর যে অপর্যাপ্ত ফসল তারা আদিম পদ্ধতিতে ফলায় তাতেই তাদের দিন-গুজরান হয়। তাই মানভূম জুড়ে যে বুনো অঞ্চল সেখানে তারা নির্বিবাদে বসবাস করে।

এখানে ভূমিজ কোল জাতিরা অধিক সংখ্যায় বাস করে। ব্রিটিশ রাজত্ব শুরু হওয়ার পর বাঙালিরা মানভূমে প্রবেশ করে। ভূমিজ কোল যারা আদতে মুন্ডা জনজাতিভূক্ত ছাড়াও আর যারা এদেশে বাস করে তারা হলোঃ- অসুর বা অগরিয়া, সরব, ভর, ধাঙ্গর, খড়িয়া, নাইট, নাইয়া, নট, সর্দার, পুরাণ, পাহাড়িয়া আর সাঁওতাল। কাঁসাই ও সুবর্ণরেখার দুই পাড় ধরে ভূমিজ কোলদের বাস ছিল। হিন্দুদের কুর্মি জাতের দল এদের বাসভূমি থেকে উৎখাত করে।

### দেশান্তরীঃ কাজের খোঁজে

মানভূম অঞ্চলের বেশ কয়েকটি পরগণা যেমন বরাভূম, পাটকুম, বাঘমুন্ডি ও হেসলা থেকে বহু ভূমিজ, সাঁওতাল, কুর্মি, মুন্ডারি মানুষ দূর আসাম, কাছার, সিলেটে চা-বাগানে কাজের খোঁজে পাড়ি দেয় কাজের জন্য। যারা একবার গেছে তারা খুব কম সংখ্যকই নিজের দেশে ফিরে আসতে পেরেছে। সারা জেলা জুড়ে আড়কাঠিরা কাজ করে। সরাসরি গ্রামে না ঢুকে তারা ছলে বলে কৌশলে গ্রামের ছেলে, মেয়ে, বিবাহিত পুরুষ-নারীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে চা বাগানের কাজে নিয়ে চলে যায়।

### সদর শহরঃ পুরুলিয়া

এই অঞ্চলের প্রশাসনিক সদর শহর পুরুলিয়া। ১৮৬৯ সালে পুরুলিয়া পুরুলিয়া পুরসভার আওতায় আসে। এখানে না আছে কোন বড় কারখানা না হয় তেমন ব্যবসা বাণিজ্য। এই

শহরে রয়েছে একটা বড় বাজার। আমদানি করা তুলো আর নুন পুরুলিয়ার বাজার থেকে সারা জেলায় বিক্রি হয়। পুরুলিয়া শহরে রয়েছে সর্বা – ডেপুটি কমিশনারের অফিস, কোর্ট, একটি জেলখানা, একটি পুলিশ থানা, পোষ্ট অফিস, বেসরকারি চাঁদায় তৈরি হওয়া একটি স্কুল বাড়ি ও একটি গির্জা। বেসরকারি চাঁদায় তৈরি হয়েছে একটি দাতব্য হাসপাতাল। স্থানীয় তহবিল দ্বারা সেটির রক্ষণাবেক্ষণ হয়।

পুরুলিয়া শহরের দক্ষিণে চাকুলতোড়ে (কাঁসাই পাড় পরগণার অন্তর্গত) বার্ষিক মেলা বসে বছরে একবার। চড়ক পূজোর সময়। চাকুলতোড়ের মেলা বসে ভাদ্র মাসে (সেপ্টেম্বর) ছাতা পরবের সময়। বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, লোহারদাগা, হাজারিবাগ থেকে ব্যবসায়ী, দোকানিরা পসরা নিয়ে আসে।

### দর্শনীয় স্থান

মানভূমের দর্শনীয় স্থান বলতে বোঝায় প্রাচীন কিছু ভগ্নাবশেষ। প্রাচীন কালে এখানে জৈন মতাবলম্বী সরক বা Srawak দের মন্দিরের

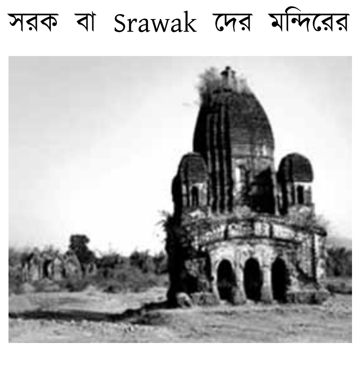

ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এই জায়গাটার নাম পালমা। এখানে রয়েছে একটা ভাঙা ভাঙা মন্দির। পাথর আর ইঁটের ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে আছে প্রধান মন্দিরের ভাঙ্গা অংশ। মন্দিরের দেব দেবীরা ডালপালা মেলা একটা পুরনো অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছে। মন্দির চত্বরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকটি পুরুষ মূর্তি। মূর্তিগুলি বেদির উপর দাঁড়িয়ে আছে। মাথার উপর চাঁদোয়া দেওয়া। এর মধ্যে একটি মূর্তি বেশ বড়। মূর্তির গড়ন দেখে বোঝা যায় এগুলি জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি।

পুরুলিয়ার কাছে ছররা গ্রামে দুটি পাথরের মন্দির রয়েছে। এগুলিকে দেউল বা দেবালয় বলে। সব মন্দিরগুলি জৈন পরম্পরার। ভূমিজ জনজাতি বসবাসের বহু বহু যুগ আগে এ অঞ্চলে অন্য এক সভ্যতার যে বিস্তার ছিল সেটা বেশ বোঝা যায়।

জয়পুর শহরের দক্ষিনে কাঁসাই নদীর ডান তীরে বোরান গ্রামে কাছে ইঁট – পাথরের তিনটি মন্দির ধ্বংসাবশেষ পেরিয়ে মাথা উঁচু করে আছে। মন্দির দেওয়ালে গাঁথা ইঁটগুলো দেখে মনে হয় যেন মেসিনে তৈরি করা। বুধপুরেও জৈন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এখানে চড়ক পুজোর মেলায় পাখি বিক্রি হয় – শ্যামা পাখি আর টিয়া। রাজমহল পাহাড়ে ধরা পাখিগুলো মেলা হয়ে পৌঁছে যায় কলকাতার বাজারে।

সুবর্ণরেখার তীরে দালামিতে রয়েছে একটা পুরনো দুর্গ, জলাধার আর সহনো দুর্গ, জলাধার আর শিব-পার্বতীর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। পাঁচকোট পাহাড়ে কোলে রয়েছে পাঞ্চেত রাজার রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। ঘন জঙ্গলের মধ্যে পড়ে রয়েছে রাজবাড়ি।

### আর্থিক অবস্থা

রেললাইন বসানোর কাজ শুরু হওয়াতে আর রাণিগঞ্জে কয়লাখনি চালু হওয়ার ফলে মানুষের রোজগারের রাস্তা খুলেছে। তাছাড়া পি ডাব্লু ডি (জন কল্যাণ বিভাগ) কাজের সুযোগ বাড়াতে পূর্ব মানভূমের মানুষজনের আর্থিক অবস্থা উন্নত হয়েছে। তবে, গোটা অঞ্চলের সাধারণ মানুষ দরিদ্রই। তাদের চাহিদা কম, ফলে নিজেদের জমি জিরেত থেকেই তাদের দিন গুজরান হয়ে যায় কোন রকমে। জেলা আধা – আদিবাসী জনজাতি যারা যেমন বাউরি, ভুঁইয়া, ডোম – এর মতো অন্যান্য যারা ভূমিহীন তাদের পক্ষে দুবেলা খাবার জোগাড় করা বেশ কঠিন। গোটা জেলায় এদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশে।

### পরিধান

সাধারণ গরীব গুর্বো পুরুষ মানুষেরা মোটা কাপড়ে খেটো ধুতি পরেন, আর গায়ে নেয় ছোট চাদর যেটা কাজের সময় মাথায় বেঁধে নেওয়া হয়। একটু সমৃদ্ধ ব্যবসায়ী হাঁটু অব্দি ধুতি পরেন, চাদর নেন বা কখনো পিরান গায়ে দেন।

### বাসা বাড়ি, আসবাবপত্র

মাটির দেওয়াল আর শাল বল্লি দিয়ে ঘেরা খড় ছাওয়া কুঁড়ে ঘরের প্রচলন এখানে। একটা বড় বাড়ি তার মধ্যে অনেক ঘর – এমনটা বাংলাদেশে দেখা গেলেও মানভূম অঞ্চলের রেওয়াজ হলো এক কামরাওয়ালা টুকরো টুকরো অনেকগুলো বাড়ি বানানো। মাদুর, মোড়া, পিতলের বাসন, মাটির বাসন ব্যবহার করা হয় রোজকার। গৃহস্থ কাজে। খাটের বদলে সাধারন মানুষের মধ্যে চারপাই – এর চল বেশি ছিল।

### চাষাবাদ

উঁচু নিচু ঢাল আর খাতে ভরা জমি। তাই জমি ঢাল বেয়ে জল বয়ে যায়, বড় জলস্রোত আর নদীর দিকে। তাই পাহাড়ি ঢালের নিচের অংশে ভেজা জমিতে ধান চাষ করা হয়। পাহাড়ি ঢালে চত্বর কেটে চাষ করা হয়। প্রত্যেক চাষ – জমির পাশে একটা ছোট বাঁধ খোঁড়া হয় চাষের জল ধরে রাখার জন্য। পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে এই ভাবে চাষ করা হয়। পাহাড়ের খাড়া ঢাল বা কঠিন পাথর থাকার দরুন যদি চাষ যোগ্য চত্বর কাটা না যায় তবে বয়ে যাওয়া জল স্রোতের ধারে ধারে ধান ক্ষেত তৈরি করা হয়। বর্ষা নামলেই খোদাই করা ধানের চত্বরে জল জমা হয়। শরতের শেষ অব্দি সেই জল ধরা থাকে। ধান, গম, বার্লি, ভুট্টা, মারুয়া, গুন্দলি, কাং, খেরি, কোদো – প্রভৃতি শস্য ফলে। এছাড়াও ছোলা, মুগ, কলাই, মটর, খেসারি, বরবটি, মুসুরি ডাল ফলানো হয়। চোদ্দ ধরনের আউশ ধান এবং বাইশ ধরনের আমন ধান ফলে এখানে। ধান থেকে যেসব ধরণের খাবার তৈরি হয়ঃ- চিড়ে, মুড়ি, হারুন (শুকনো ধান), খই, মুড়কি, খইচুড়, রুটি, পিঠে। এছাড়াও ধান সেদ্ধ করে পচিয়ে পাচওয়াই বানানো হয়।

### তসর সিল্ক চাষ

মানভূম অঞ্চলে বছরে বেশ ভালো রকম তসর সিল্ক তৈরি হয়। জঙ্গলের গাছে শুঁয়ো পোকা তৈরি হলে রেশম চাষিরা জঙ্গলে বাস করতে থাকে। পোকাগুলিকে পাখি পোকার হাত থেকে বাঁচায়, ওদের উপর নজর রাখে। গুটি হওয়ার আগে অব্দি চাষিরা মাছ-মাংস ছোঁয় না, তেল, হলুদ ব্যবহার করে না। এটা তাদের সংস্কার। এর ফলে নাকি শুঁয়োপোকারা রক্ষা পায়। এরপর গুটি তৈরি হলে সেগুলিকে সংগ্রহ করে ডিম ফুটে শুঁয়োপোকা বেরোলে তাদের গাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আসন, অর্জুন, শাল গাছে শুঁয়োপোকাগুলো ছেড়ে দেওয়া হয়। এই শুঁয়োপোকা থেকে আবার গুটি তৈরি হয়। গুটি ফুটে মথ্ তৈরি হয়। পুরুষ মথেরা উড়ে গেলেও, মেয়ে মথদের রেখে দেওয়া হয় তাদের ডানা ছেঁটে দিয়ে।

### প্রাকৃতিক বিপর্যয়

মানভূম অঞ্চলের প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলতে যেটা ঘটে সেটা হল

...এর পর ৫ পাতায়

# মানভূম অঞ্চল

...... ৪ পাতার পর

খরা। বন্যার প্রকোপ এখানে নেই। ১৮৬৫ সালে পঙ্গপালের প্রকোপে শস্য ক্ষতি হয়েছিল। আর ১৮৬৬ সালে নেমে এসেছিলো ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ। ১৮৬৩-৬৪ তে ধানের ফলন কম হয়েছিল অথচ ১৮৬৪ তে চালের রপ্তানি গেছিল বেড়ে। পরের বছর দেখা দেয় ভয়ঙ্কর খরা। আর অতি বৃষ্টিতে আউস ধানের ক্ষতি হয়। সেবার শীতের আমন ধানের ফলনও কম হয়। চালের দাম স্থির করা, রপ্তানি বন্ধ করার আবেদন পাঠানো হলেও জেলা কমিশনার দায়িত্ব এড়িয়ে যান।

জেলার পুলিশ সুপারের রিপোর্টে থেকে জানা যায় সে ১৮৬৬-র মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে জেলার ডাকাতির সংখ্যা ভয়ানক ভাবে বেড়ে গেছিল। কোন মূল্যবান বস্ত নয় খাদ্য সামগ্রী লুটপাট করা হয়েছে। মজুতদারেরা চাল বিক্রি বন্ধ করে দেয়। চড়া দামে চাল বিকোতে থাকে। গরীব মানুষেরা তো ছিলই, দেখা গেল ধীরে ধীরে অবস্থাপন্ন ঘরেও অন্নাভাব। মহুয়া খেয়ে লোকে দিন কাটাচ্ছিল। শস্য লুটের খবরও আসছিল জেলার ত্রাণশিবির খোলা হয়। এই শিবিরে প্রত্যেককে প্রতিদিন আধ সের করে চাল দেওয়া হবে স্থির করা হয়। ইতিমধ্যে অনাহারে বহু মানুষ মারা গেছে। কলকাতা থেকে বরাকর অব্দি রেল পথে চাল পাঠানো হয়। যার বেশির ভাগটাই সুষ্টু ভাবে মজুত রাখার ব্যবস্থা না থাকায় নষ্ট হয়ে যায়। বরাকর থেকে পুরুলিয়া সড়ক পথে চাল পোঁছাতে আরও কিছুদিন সময় নেয়। কারন ততদিনে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। জেলা জুড়ে ততদিন আরও কয়েকটি ত্রান শিবির খোলা হয়েছে। চালের দামে নিয়ন্ত্রণ আনা গেছে। জমিদারদের উদ্দেশ্যে ডেপুটি কমিশনার নির্দেশ দেন যে তারা যেন ১৮৬৬-এর শীতের ফসল তার রায়তদের হাতেই ছেড়ে দেন। দেনা শোধের নামে যেন চাষিদের তোলা ফসল তারা ক্রোক না করেন। এছাড়াও নির্দেশ দেওয়া হয় যে মহাজনদেরও চাষিদের তোলা ফসল ক্রোক করে নেওয়ার অধিকার নেই। এর জন্য কোর্টের নির্দেশ দরকার। ধীরে ধীরে অবস্থা নিয়ন্ত্রনে আসে। ১৮৬৬-এর নভেম্বর মাস থেকে ধীরে ধীরে ত্রাণ শিবির বন্ধ করা হয়। দুর্ভিক্ষ-জনিত দুর্দশা নিয়ন্ত্রণে ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে কমিশনারের মতন্তরের বিষয়টি বেশ লক্ষ্যনীয়। দুর্ভিক্ষ আঁচ করে ডেপুটি কমিশনার যখন চাইছেন ত্রাণ তহবিল তৈরি করতে কমিশনার চাইছেন জমিদাররা যেন তাদের রায়তদের সাহায্য করে এবং তার মতে সরকারের কাজ হবে রোজগারের উপায় বাড়ানোর চেষ্টা করা। ডেপুটি কমিশনার যখন চাইছেন ত্রাণের উপায় নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে সেই সময় কমিশনার চাইছেন জনসাধারণ যাতে দেশান্তরী হয় বা তাদের রোজগারের ব্যবস্থা করতে।

**খেলা আর আমোদ প্রমোদ**

মানভূম অঞ্চলের সবচেয়ে আমোদ আনন্দের উপর হল নাচ। আদিবাসী মানুষের জীবনে নাচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও ভূমিজ জনজাতি জীবনে হকির মতো একধরনের খেলার প্রচলন আছে। কাপড় দিয়ে ভরা আর চামড়া দিয়ে মোড়া বল নিয়ে লাঠির সাহায্যে এই খেলা খেলতে হয়। খেলাটা শুরু হয় বলটাকে উঁচু করে ছুঁড়ে দিয়ে। দুই দল চেষ্টা করে বিপক্ষের গোলে বলটাকে ঠেলে দিতে। প্রায় দুশো জন মিলে এই খেলা খেলে। খেলতে

খেলতে মারপিট হয়। হিন্দিতে এদের পুডি খেল বলে। শিকারও এই অঞ্চলের মনরঞ্জনের বিষয়।

**কৃষকদের অবস্থা**

মানভূম অঞ্চলের বেশির ভাগ জমিই বড় বড় জমিদারদের দখলে। ছোট ছোট চাষিরা ১২ বছরের চুক্তির ভিত্তিতে জমি ব্যবহারের অধিকার পায়। বেশির ভাগ গরীব চাষি মহাজন আর সুদ ব্যবসায়ীদের কাছে ঋণগ্রস্থ।

**রেশম সিল্ক চাষ**

মেয়ে মথরা নির্দিষ্ট গাছে ডিম পাড়ে, তৈরি হয় গুটি। বছরে কোন সময়ে শুঁয়োপোকারা ডিম ফুটে বেরোয় আর তারা কোন গাছের পাতা খেয়ে গুটি হয় তার উপর নির্ভর করে তসর সুতোর গুণ।

রঘুনাথপুর, সিনবাজার আর গোপীনাথপুরে সিল্কের কাপড় বোনার কল রয়েছে। এখানে বোনা সিল্ক কাপড় রপ্তানি করা হয়। লাল বা নীল পাড় সুতীর কাপড় তাঁতে বোনা হয়। এটি একটি ঘরোয়া শিল্প। সুতীর কাপড় রপ্তানির জন্য তৈরি হয় না।

**স্বাস্থ্যবিধি**

রঘুনাথপুর, ঝালদা, মান-বাজারের মতো বড় বড় গ্রাম ছাড়া আর কোন স্থানে স্বাস্থ্যবিধি রক্ষণাবেক্ষণের কোন প্রচেষ্টা নেই। যে সব শহর পুরসভার অন্তর্গত সেখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে যত্ন নেওয়া হয়। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ইউরোপীয় ধ্যান ধারণার সঙ্গে এদেশের আচার আচরণের বিষম ফারাক লক্ষ্য করা যায়। এদেশের বাড়ি ঘরগুলি তৈরি করার সময় আলো-বাতাস চলাচলের বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়। ঘরের চারপাশ অপরিষ্কার থাকে। চারদিকে শুকনো পচা পাতা, পশুর বিষ্ঠা। হাড়গোড়, ভাঙ্গা মাটির বাসন পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুরুলিয়া সদরের স্বাস্থ্যবিধি সুন্দর ভাবে রক্ষা করা হয়।

পুরুলিয়া আর পান্দরায় দুটো দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র চলে। পুরুলিয়ার হাসপাতালটিতে গড়ে ১৫ জন রুগি রোজ আসে। মে জুন জুলাই মাসে কলেরার প্রকোপ লাগে। এই হাসপাতালে রুগি ভর্তির ব্যবস্থা আছে। এই হাসপাতালটি ১৮৬৬ সালে তৈরি হয়েছিল। দাতব্য প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। মাঝে মধ্যেই চাঁদা বাকি থাকে। পান্ডার চিকিৎসাকেন্দ্রটি ১৮৭২ সালে তৈরি হয়। রানি হিঙল কুমারির অনুদানে হাসপাতাল বাড়িটি তৈরি হয়। প্রতি মাসে রানির তরফ থেকে চাঁদাও আসে। সরকার পক্ষ থেকেও অনুদান পাঠানো হয়।

**ভূমিজ কোল জনজাতির দুই ধারা**

পশ্চিম মানভূমের ভূমিজ কোলরা মুন্ডারি ভাষার কথা বলে। রুরুকে তারা পূজো করে। মস্ত এক সিঁদুর মাখানো শিক্ষা হলো বুরু। বুরুকে বসানো হয় গ্রামের প্রান্তে কুঞ্জবনে। এই বনটিকে পবিত্র মনে করা হয়। পাল আর অন্যান্য গাছে ঘেরা নির্দিষ্ট কুঞ্জবনটিকে সরনা বলা হয়। এখানেই পালন করা হয় সারহুল উৎসব।

পূর্ব মানভূমের ভূমিজ কোলরা মুন্ডারি ভাষা ত্যাগ করেছে। মাঝের অযোধ্যা পাহাড়ের দুই ধারের মুন্ডা জাতিকে ফারাক করে দিয়েছে। পূর্ব মানভূমের ভূমিজরা নিজেদের আর মুন্ডা বলে না। ভূমিজ বা সর্দার বলে পরিচয় দেয়। বাংলায় কথা বলে। হিন্দু ধর্মের রীতি নীতি আয়ত্ব করেছে তারা।

## এসো তাঁদের গল্প শোনাই

# বিরসা মুন্ডা

নভেম্বর ১৫, ১৮৭৫
জুন ৯, ১৯০০

বিরসা মুন্ডা আর তার উলগুলানের (বিদ্রোহ) কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলে নিতে হয় কেন বিরসাকে নেতা হতে হয়েছিল। কেন তাঁকে মুন্ডা জীবনে বদল আনার কথা বলতে হয়েছিল? ছোটনাগপুরের রাঁচি – সিংভূম – পালামৌ অঞ্চল জুড়ে বাস করত আদিবাসীরা – মুন্ডা, ওরাওঁ, লোধা, সাঁওতাল। তাদের মধ্যে মুন্ডাদের সংখ্যা বেশি। এই অঞ্চল পাহাড় – টিলা – বন – জঙ্গল – নদী দিয়ে ভরা। আর বন – জঙ্গলের গাছপালা – ফল – মূল – কন্দ কাঠ মধু বেচে পশু পাখির মাংস খেয়ে মুন্ডাদের জীবন চলে। মানুষের ইতিহাস মানেই দমন-পীড়নের ইতিহাস আর তার প্রতিবাদের ইতিহাস।

এই সাধারণ, সরল জীবনে ব্যস্ত থাকা আদিবাসীঃ মুন্ডা, কোল, সাঁওতালদের উপর যুগ যুগ ধরে নেমে এসেছে নির্যাতন, দমন পীড়ন। ভারতে ইংরেজ শাসন বলবৎ হলে তারাও আদিবাসীদের বিশেষ করে মুন্ডাদের ছেড়ে কথা বলে না। জমিদার – রাজা – ঠিকাদার মহাজনেরা তো অত্যাচার অবিচার চালাত।

ইংরেজদের হাত ধরে তাদের শোষণ আরো বেড়ে গেল। এই অঞ্চলে মাটির তলায় প্রচুর খনিজ – লোহা, তামা, কয়লা, অভ্র খনিজের লোভে খনিমালিক, কারখানার মালিকেরাও ছোটনাগপুর অঞ্চলের দখল নিল। ইংরেজ সরকার সহ সবধরনের ক্ষমতাবানদের আক্রমণে মুন্ডাদের জীবন অতিষ্ট হয়ে ওঠে। জমিজমা হারিয়ে তারা তখন হত দরিদ্র। মহাজনদের কাছে ঋনে বাঁধা পড়েছে, তাদের সবাই। বছর বছর বিনা পয়সায় বেগার খাটার বেঠবেগারি প্রথা চালু হয়েছে। বড়লোকেদের দমন-পীড়নের মুন্ডাদের নিজস্ব ধর্ম – সংস্কৃতি ছিন্ন ভিন্ন। ইংরেজদের হাত ধরে গ্রামে ঢুকে পড়েছে মিশনারিদের দল। অনেক মুন্ডা ধর্মান্তরিত হয়েছে। তাদের বোঝানো হয়েছে যে মুন্ডাদের আদি ধর্ম কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নিচু। সরকারি সুবিধা পাওয়ার আশায় আর পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্যও অনেকে খ্রীষ্টান হয়েছে। শিল্পপতিরা বড় বড় কারখানা বানিয়ে আদিবাসীদের কুলি বানিয়ে ছেড়েছে। নিজেদের অঞ্চলের খনিজ বিক্রিতে তাদের অধিকার নেই। জমি হারানো, কাজ হারানো গরীব, আদিবাসী মানুষগুলোকে আড়কাঠিরা ভুলিয়ে ভালিয়ে চা-বাগানে কুলির কাজ করতে চালান করেছে।

আর ঠিক এই সময় বিরসা জোয়ান হয়ে উঠেছে। বোহোনডার ছাগল চড়ানো ছেড়ে, চালকাদ (জন্মভিটা) ছেড়ে চলে যায় জার্মান মিশনারি স্কুলে।

পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে কানে আসে কোল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, মুন্দা সর্দারদের বিদ্রোহের কথা। মুন্ডা জাতি তখন ছেয়ে আছে কবে আবার তাদের মধ্যে এক নেতা জন্মাবে, যে তাদের জাতিকে ফিরিয়ে দেবে মুন্ডা জাতির হারানো সম্মান, আত্মমর্যাদা!

নিজের চারপাশের দুর্দশার দেখে মনে মনে বিরসা সংকল্প করে। সংকল্প করে যে ছোটনাগপুরের পাহাড়ে-জঙ্গলে-গ্রামে মুন্ডারাজ ফিরিয়ে আনবে। বিরসার সঙ্কল্পে ইন্ধন জোগায় ইংরেজদের জঙ্গল আইন। যে আইনে আদিবাসীদের থেকে তাদের জঙ্গলের প্রতি অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়। আদিবাসীদের হাত থেকে বন-জঙ্গল-কাঠ-মধু-ফল-মূল সংরক্ষণ করতে হবে। বন হয়ে যাবে সরকারের সম্পত্তি।

আদিবাসীদের কাছে বন-জঙ্গল হলো মা। গাছ হলো দেবতা। বিরসা জ্বলে উঠলো।

বিরসা মুন্ডাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলল এক নতুন ধর্ম যা আত্ম সম্মানের কথা বলে, মুক্তির কথা বলে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার নিয়ে লড়াই-এর কথা বলে, জমিদার-জোতদার-ঠিকেদারদের বিরুদ্ধে তীর ধনুক তোলার কথা বলে।

বিরসা নিজে খ্রীষ্টান মিশনারি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বুঝেছিল মুন্ডাদের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, মদের নেশা থেকে মুক্ত করতে হবে। ইংরেজ সরকার গ্রামে গ্রামে মদের দোকান খুলেছিল। মুন্ডাদের মধ্যে, আদিবাসীদের মধ্যে নেশার ঘোর ভাঙ্গাতে হবে। বিরসা তাঁর টাঙ্গি, বল্লম, তীর-ধনুকের ঝংকার দিয়ে মুন্ডা জাতির মনে সাহস জুগিয়ে ছিল – ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার। কুড়ি বছর বয়সে সে মুক্ত মুন্ডা-রাজত্বের স্বপ্ন দেখে।

তার বীজ বপন করে আপামর মুন্ডার মনে। তাঁর স্বপ্নের কথা ছড়িয়ে পড়ে মুন্ডাদের গ্রামের পর গ্রামে। জমিদারদের বেগার খাটা ছেড়ে, খাজনা দেওয়া ছেড়ে মুন্ডারা দলে দলে আসে বিরসার কথা শুনতে। দলে দলে খ্রীষ্টান মুন্ডারা গির্জা ছেড়ে মুন্ডাদের আদি ধর্মে-ফেরৎ আসে। ইংরেজ সরকার জমিদার-ঠিকেদারদের সাহায্যে বিরসাকে গ্রেপ্তার করে। বিনা বিচারে দুই বছরের জেল হয়। বিরসা ছাড়া পায় দুই বছর পর। দ্বিগুণ মাত্রায় তাঁর বিদ্রোহের প্রস্তুতি বেড়ে যায়। মুন্ডা গ্রামে নেমে আসে পুলিশি শাসন। বিরসা তার দলবল নিয়ে পাহাড়ের গুহায়, জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। সেখান থেকে উলগুলানের বার্তা পাঠায়। গ্রাম ছেড়ে মুন্ডা পুরুষ-নারী লড়াই-এ নেমে পড়ে। তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হয় ইংরেজ পাদ্রী-মিশনারি-পুলিশ-সরকারিকর্মচারী-জোতদার-জমিদার।

ইংরেজ শাসক পাহাড়ে-বনে-গ্রামে পুলিশ সৈন্য নামায়। তীর, ধনুক, পাথর দিয়ে মুন্ডারা লড়ে বন্দুকের বিরুদ্ধে। রেল টেলিগ্রাফ, সৈন্য সামন্তের তুলনায় বিরসা আর তাঁর দলের শক্তি ছিল সামান্য। পাঁচ বছর ধরে চলে বিরসার উলগুলান। পঁচিশ বছরের বিরসা আর তার দল গ্রেপ্তার হয়। অবশেষে জেলেই মারা যায় বিরসা। মুন্ডাদের উপর নেমে আসে সরকারী নির্যাতন।

কিন্তু মজাটা হলো ইংরেজ বিরোধী ইতিহাসে বিরসা মুন্ডা আর তাঁর দলের বিদ্রোহ স্থান পেয়ে যায়। দেশ প্রেমের ইতিহাসে বিরসার নাম লেখা হয়ে গেল।

আদিবাসী অঞ্চলের সাধারণ মানুষ যখন নিজেদের অধিকারের জন্য লড়ে, হাতিয়ার ওঠায়, ঐক্যবদ্ধ হয়, বিরসা মুন্ডার উলগুলান এগিয়ে যায় আরো কয়েক কদম। বিরসার স্বপ্ন সার্থক হয়।

■■

# গল্প হলেও সত্যি

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় তপন পূর্বচক্রের অন্তর্গত চেঁচাই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি যেভাবে শিক্ষাকে ভাবছে তা শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনাই নয়-বরঞ্চ তাদের সার্বিক বিকাশের দিকটাকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রতিটি ঘর যেন খুশির খেয়া ভাসিয়ে দিয়েছে। দেওয়ালে আঁকা ছবি, শিশুদের মনোরঞ্জনকারী পরিবেশ তাদের পুষ্টিগত মানের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর পুরো বিদ্যালয়টিকে করে তুলেছে এক ভেলা এবং গ্রামবাসীদের সাথে বিদ্যালয়ের একটি সুম্পর্ক গড়ে উঠেছে। 'নবদিশা' এই ধরণের বিদ্যালয়ের কথাই ভাবে। সেই জন্য নবদিশার এই সংকলনে বিদ্যালয়ের উপর পূর্ণ প্রতিবেদন রাখা হল।

# এক টুকরো কোলাজ

**পবিত্র মোহান্ত**

**(চেঁচাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, তপন পূর্বচক্র-দক্ষিণ দিনাজপুর)**

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম চেঁচাই। মূলত আদিবাসী মানুষের বাস। সামান্য কিছু তপশীলভুক্ত পরিবার বাস করে এ গ্রামে। তপন ব্লকের ১১ নম্বর গোফানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন এই গ্রামে ঢুকতেই নজরে পড়ব সারি সারি তাল গাছ। জেলা সদর বালুরঘাট থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার দূরে বালাপুর। বালাপুরে ঢোকার আগেই ডানদিকে ইউক্যালিপটাস, আকাশমণি ও তালগাছের মধ্য দিয়ে আঁকা বাঁকা রাস্তা। পাকা রাস্তা থেকে দু'কিলোমিটার দূরে। এ গ্রামেই ১৯৮৩ সালে গ্রামবাসীদের দানে তৈরী হয় চেঁচাই প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রথমে গ্রামবাসীদের তৈরী একটি মাটির ঘরে বিদ্যালয় শুরু হলেও সর্বশিক্ষা

মিশনের দৌলতে একটি পাকা ঘর তৈরী হয়। সেখানে মাত্র ১০ জন ছাত্র নিয়ে চলত এই বিদ্যালয়। ২০০৩ সালে মিড-ডে মিল চালুর সময় থেকেই বিপত্তি বাধে। দুই গোষ্ঠীর কাজিয়া রাজনৈতিক গোলমালের রূপ নেয়। একটানা সাড়ে ৬ বছর বন্ধ থাকে এই মিড-ডে মিল। গোটা গ্রাম দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আদিবাসীর প্রধান উৎসব করম পূজাও হতে থাকে দুটি আলাদা প্যান্ডেলে। এই অবস্থায় যখন প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করি তখন সতীর্থরা বাঁধা দেয়। অন্য বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। গোলমেলে গ্রামে গিয়ে প্রাণ হারানোর আশঙ্কার গল্প শোনায় সকলে।

যেদিন এখানে প্রধান শিক্ষক হিসাবে এখানে যোগ দিয়েছিলাম, দেখেছিলাম রাস্তার দু'ধারে সদয় কয়েক হাজার তালগাছ লাগানো হয়েছে। জানলাম এই গ্রামের বাসিন্দা নিমাই টিগ্গা নামে এক ব্যক্তি, ব্যক্তিগত উদ্যোগে লাগিয়েছেন। সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম যে এই গ্রামে প্রভূত সম্পদ রয়েছে। প্রয়োজন শুধু পরিচর্যার। তালগাছ একদিকে যেমন ভূমিক্ষয় রোধ করে, তেমনি এই গাছ চুরির সম্ভাবনাও অনেক কম। তালগাছে বাবুই পাখি বাসা বাঁধে। বাবুই পাখি থাকলে ঐ এলাকার আশেপাশে চাষের জমির ফসলে পোকার সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেক কম।

এত দূরদর্শিতা যাদের রয়েছে, তাদের মধ্যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন রয়েছে। বিদ্যালয়ে অনেক ঘুরপথে ঢুকতে হয়। বিদ্যালয় চত্বরের মাঠটি নিচু ও কর্দমাক্ত। সেখানে গ্রামবাসীরা বাঁশ টানিয়ে পাট শুকোয়। বিদ্যালয়ে ঢোকার রাস্তা থাকে না। একটি মাত্র ঘরে কোনোমতে ক্লাস চলে। গ্রামের গোলমালের সুযোগ নিয়ে অন্য একটি ঘর অর্ধসমাপ্ত রেখে টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদার। বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সম্পাদকের কাছ থেকে প্রায় ৬ হাজার টাকা নিয়ে কোনো মতে বিদ্যালয় পরিচালনা শুরু করলাম ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে।

শুরুতে একটাই চ্যালেঞ্জ ছেলেমেয়েদের জন্য মিড-ডে মিল চালু করা। একাজে নামতেই গোষ্ঠীর সদস্যরা ছুটে এল। শুরু হল নানা ভাবে চাপ তৈরি করা। রাজনৈতিক দলের জেলা নেতারাও ফোনে রীতিমত হুমকি দিতে থাকলো যাতে মিড-ডে মিল চালু না করা হয়। বুঝলাম, গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিতে না পারলে এ কাজ অসম্ভব। ইতিবাচক কাজের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছাতে হবে। নিজের উদ্যোগে বিদ্যালয় চত্তর পরিষ্কার করে একটি ফুলবাগান তৈরী করা হল।

কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রামজুড়ে নিন্দুকেরা প্রচার চালাল যে বাগান তৈরীর জন্য অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তর থেকে ১০ হাজার টাকা পেয়েছেন প্রধান শিক্ষক। যার মধ্যে ৫ হাজার টাকায় বাগান তৈরী করে বাকি টাকা আত্মসাৎ করেছে। গ্রাম ছাড়িয়ে এই খবর পাশের গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। এক শুভানুধ্যায়ী মারফৎ জানতে পারলাম। তড়িঘড়ি তৎকালীন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শককে ডেকে এনে এক সভা ডাকা হলো। গ্রামবাসী সকলের সামনে বিদ্যালয় পরিদর্শক অপূর্ব কুমার সরকার জানালেন যে একাজের জন্য কোনো অর্থই সরকারীভাবে বরাদ্দ নেই বা থাকে না। প্রধান শিক্ষক ব্যক্তিগত উদ্যোগে একাজ করেছেন। পরবর্তীকালে গ্রামবাসীদের সকলকে দুলাল মজুমদার নামে এক শুভানুধ্যায়ী কম্বল বিতরণ করলেন বিদ্যালয়ের উদ্যোগে। এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসাবে তকমা দিয়ে নিন্দুকেরা প্রচার চালালো যে মাষ্টারমশাই রাজনীতি করতে এসেছেন এখানে। এভাবে একের পর এক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ধীরে ধীরে গ্রামবাসীরা বুঝতে পারলো একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। গোষ্ঠীর সদস্যদের নানাভাবে বুঝিয়ে ব্যর্থ হলাম।

কিন্তু গ্রামবাসীরা মিলিতভাবে একাধিক বৈঠকের পর বুঝতে পারলো যে গোষ্ঠীর রাজনীতির কারণে শিশুরা মিড ডে মিলের আহার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। টানা ৪ মাসের চেষ্টার পরে ২০১০ সালের ২০ শে জানুয়ারী সরস্বতী পূজার দিনে চালু হল মিড ডে মিল। সরকারী ভাবে যারা রান্নার বরাত পেয়েছিল তাদের দিয়ে রীতিমত পুলিস মোতায়েন করে। যদিও এরপর থেকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে

হয়নি। ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর জোর দিলাম। গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে। শেষ হল অর্ধসমাপ্ত ওই ঘরের কাজ। বিদ্যালয়গৃহ রং করে আধুনিকীকরণ কাজ শুরু হল। বিদ্যালয়টি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হলো।

তৈরী হল ছাত্রছাত্রীদের জন্য পৃথক পৃথক টাইলস্ ও মার্বেল দিয়ে শৌচাগার। বিদ্যালয়ের সাবেকি মাটির ঘরকে আধুনিকভাবে গড়ে তোলা হলো। সেখানেও একটি পৃথক ভাবে শৌচাগার চালু হলো। প্রধান শিক্ষকের অফিস তৈরী হলো। দোতলা নির্মাণ করে সেখানে টাইলস ও মার্বেল দিয়ে আধুনিক মানের রান্নাঘর। যাতে চিমনি, গ্যাস, ফ্রিজ, মাইক্রোওয়েভ, মিক্সচার গ্রাইন্ডার ব্যবহার করা হচ্ছে। চালু হল ছাত্রছাত্রীদের জন্য ডাইনিং হল ও ডাইনিং টেবিলের ব্যবস্থা। সাব মার্সিবল পাম্প বসিয়ে বিদ্যালয়ের উপরে ও নিচতলায় হাত ধোবার ট্যাপ। প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে রয়েছে কম্পিউটারের মাধ্যমে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা। আধুনিক মানের বসার বেঞ্চ রয়েছে ক্লাসগুলিতে।

বিদ্যালয়ের একপাশে রয়েছে বিদ্যাসাগরের পূর্ণাবয়ব মূর্তি, রয়েছে দেওয়াল জুড়ে নানা মনীষীদের ছবি ও তাতে ফুল দেওয়ার ব্যবস্থা। রয়েছে দেওয়াল পত্রিকা, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা, টুল বক্স, জুতো রাখার বক্স। বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য অ্যাকোয়া গার্ড। ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে আমাদের দোকান। যেখান থেকে পড়ুয়ারা নিজেরা নিজেদের খাতা, পেন্সিল, কলম, রুল, রবার, স্কেল সহ যাবতীয় জিনিস কিনতে পারে। এই দোকানে কোনো মালিক নেই। নিজেরা কেনার পর সেখানে রাখা বাক্সের টাকা রেখে চলে যায়। বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ, পাঁচিল ও ঘরের ও পাইরের দেওয়াল জুড়ে রয়েছে নানা ধরনের চিত্র। মাঠে রয়েছে দোলনা সহ নানা ধরনের খেলার উপকরণ। বিদ্যালয় চত্বরে রয়েছে কিচেন গার্ডেন। হাত ধোবার জলকে বিশুদ্ধ করে তা সবজি বাগানে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। বিদ্যালয় চত্তর জুড়ে নজরদারীর জন্য রয়েছে সি সি টিভি। বিদ্যালয়ের উদ্যোগে গোটা গ্রাম জুড়ে চালু হয়েছে সাউন্ড সিস্টেম। সেখানে প্রতিদিন নিয়ম করে তথ্য আদানপ্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন ভক্তিমূলক গান, খবর পরিবেশন করা হয়। বিদ্যালয়ে রয়েছে সাইরেন। অটোম্যাটিক টাইমার লাগনো এই সাইরেন প্রতিদিন ৪ বার বাজানো হয়। গ্রামবাসীদের চাহিদা মত। প্রায় দু'কিলোমিটার দূর থেকে সাইরেনের শব্দ শুনে ঘুম ভাঙে গ্রামবাসীদের। আবার বিদ্যালয় শুরু ও বন্ধ হয় নিয়ম মেনে। রয়েছে ছাত্রছাত্রীদের জন্য একাধিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

ব্রতচারী, ব্যয়াম, প্যারেড, গান, অঙ্কন, সেলাই, পাটের হস্তশিল্প, মাটির কাজ পড়ুয়াদের হাতে কলমে নিয়মিত শেখানো হয়। বিদ্যালয়ের উদ্যোগে গ্রামের ১০০ শতাংশ বাড়িতেই শৌচাগার নির্মাণ ও নিয়মিত ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১২ সালে জেলার নির্মল ও শিশুমিত্র পুরস্কার পায় এই বিদ্যালয়। সম্প্রতি ইউনিসেফের দিল্লীর এক বিশেষ প্রতিনিধিদল এসে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করে এই বিদ্যালয়কে ঘিরে। চেঁচাই প্রাথমিক বিদ্যালয় আজ শুধু তপনের নয়, গোটা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গর্ব।

ভারতবর্ষ যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মান্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ। ...... কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। _ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# বিখ্যাত চিন্তাবিদদের ভাবনায় শিক্ষা

### ইউনেস্কো (UNESCO) সংকলিত শিক্ষা চিন্তাবিদদের জীবন ও ভাবনার বিবরণ

## ইভান ইলিচ

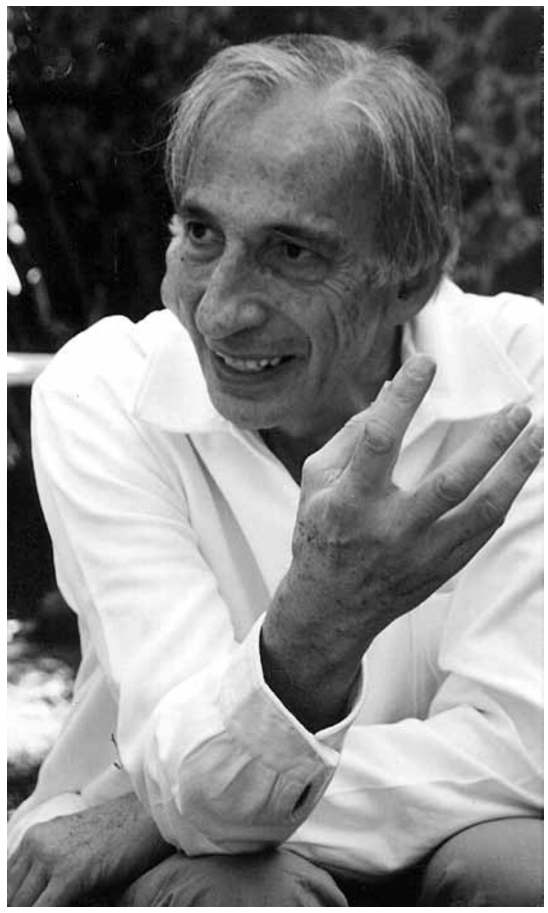

সেপ্টেম্বর ৪, ১৯২৬
ডিসেম্বর ২, ২০০২

এক যে ছিল রাজার দেশ
সব রকমের ভালো
রাতে সেথায় বেজায় রোদ
দিনে চাঁদের আলো।

এমন উল্টো অবস্থা যদিও বা হয়। কিন্তু এমনটা কি হওয়া সম্ভব – পড়াশোনা – শেখা – জানা চলছে কিন্তু স্কুল নেই, বিদ্যালয় নেই, ক্লাসরুম নেই। আর এমনটা হতে বাধা কোথায়? যখন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই কিছু না কিছু শেখা জানার সুযোগ রয়ে যায়। কেউ না কেউ শেখায় আর আমরা শিখি। এই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধানত তিনটি লক্ষ্য থাকবেঃ-

১) যারা শিখতে চায়, জানতে চায় তাদের সামনে শেখা – জানার সবরকমের রসদ জোগান রাখা। পড়ুয়ারা যে কোন সময় এই শেখা – জানার প্রক্রিয়ার প্রবেশ করতে পারবে।

২) এই শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হবে যে যিনি কোন বিষয় জানেন বোঝেন এবং তিনি যদি তার জ্ঞান ভাগ করে নিতে চান এবং যাঁরা এই জ্ঞান গ্রহণ করতে চান, শিখতে চান, জানতে চান – এই দুই দলের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করা সম্ভব হবে।

৩) কোন বিষয়ে কেউ যদি তাঁর মতামত দিতে চান, বিতর্কে অংশ গ্রহণ করতে চান তবে এই শিক্ষা ব্যবস্থায় তাকে তার মতামত জানানো সুযোগ থাকবে।

এছাড়াও যথোপযুক্ত শেখা-জানার প্রক্রিয়া সম্ভব করে তোলার জন্য থাকবে নানা ধরনের পরিষেবা।

**যখন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই কিছু না কিছু শেখা জানার সুযোগ রয়ে যায়। কেউ না কেউ শেখায় আর আমরা শিখি।**

যেমন ধরুন বইপত্র ও নানা ধরনের শিক্ষণ সামগ্রী পাওয়া যাবে লাইব্রেরী, পরীক্ষাগার ও প্রদর্শনশালাগুলিতে। এখানে এসে পড়ুয়ারা তাদের চাহিদা অনুযায়ী পড়াশোনার রসদ জোগাড় করে নিতে পারবে।

আমাদের চারপাশ ঘিরে রয়েছে নানান প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষ নানান প্রয়োজনে আসা – যাওয়া করে। যেমন ধরুন কারখানা, রেলস্টেশন, বিমানবন্দর ইত্যাদি। এই প্রতিষ্ঠানগুলির পাশাপাশি অবস্থান করে নানান বিনোদন কেন্দ্র যেমন নাট্যশালা (থিয়েটার), জাদুঘর, সিনেমা। আমরা যে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলতে বসেছি সেখানে এই বিনোদনকেন্দ্রগুলো স্কুলের বিকল্প শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে উঠবে।

জাদুঘর, থিয়েটারের মতো বিনোদনকেন্দ্রগুলোতে রাখা থাকবে কারখানা, বিমানবন্দর, রেলস্টেশন বা আরো অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে ব্যবহার হয় এমন সব নিত্য প্রয়োজনীয় উপকরণ। আর জাদুঘর বা থিয়েটার দেখতে এসে হবু পড়ুয়ারা কিছুটা সময় সহরা কিছুটা সময় শিক্ষানবিস হিসাবে এখানকার উপকরণ ব্যবহার করে কাজ শিখে যেতে পারবে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় থাকবে নানা ধরনের নেটওয়ার্ক। দক্ষতা আদান প্রদানের নেটওয়ার্ক – যার সাহায্যে একজন দক্ষ বিশেষজ্ঞ তার জ্ঞান ভাগ করে নিতে পারবেন জানতে ও শিখতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সঙ্গে।

এছাড়াও এমন সব নেটওয়ার্কের ব্যবস্থা থাকবে যেখানে নানান শিক্ষনীয় কাজের বিবরণী দেওয়া থাকবে জিজ্ঞাসু সতীর্থরা এই নেটওয়ার্কের সাহায্য নিয়ে তাদের অজানা বিষয়গুলি জেনে নিতে পারবে।

এহেন মুক্ত, জীবনভোর শেখা – পড়ার ব্যবস্থা কথা ভেবে ছিলেন ইভান ইলিচ। ১৯২৬ সালে ভিয়েনায় জন্মে ছিলেন। পড়াশোনা করেছিলেন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালিত স্কুলে। কর্মজীবনে প্রথম দিকে ধর্মযাজক ছিলেন। পুয়ের্তো রিকোর ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেছিলেন। এখানে থাকাকালীন নানা দেশের নানা সংস্কৃতির মানুষের সংস্পর্শে আসেন। বিচিত্র সংস্কৃতির মেলবন্ধনে ভাবনা জাগে তাঁর মনে। তৈরি করেন আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগ কেন্দ্র। ভাষা শিক্ষার সাহায্যে নিজের সংস্কৃতির চৌহদ্দি পেরিয়ে অন্যান্য সংস্কৃতিকে জানা বোঝা দেখার চোখ তৈরি করাই ছিল এই কেন্দ্রের কাজ। পরে নিজের সংস্কৃতির চৌহদ্দি পেরিয়ে অন্যান্য সংস্কৃতিকে জানা বোঝা দেখার চোখ তৈরি করাই ছিল এই কেন্দ্রে কাজ। পুয়ের্তো রিকো ছেড়ে চলে আসেন লাতিন আমেরিকার মেক্সিকোতে। ১৯৬১ সালে এখানেও তৈরি করেন আরও একটি আন্তঃসাংস্কৃতিক সংযোগ কেন্দ্র। আর

**"সোনার পাথর বাটি"। কীভাবে স্কুল ব্যবস্থার বেড়াজাল টপকে শিক্ষা সর্বজনীন হয়ে উঠবে এই ছিল তাঁর ভাবনা।**

এই কেন্দ্রে বসেই তিনি ভাবতে শুরু করেন এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থার কথা যা স্কুল নামক প্রতিষ্ঠানটির ওপরে সর্বতো ভাবে কেন্দ্রিভূত হবে না। স্কুল ভিত্তিক শিক্ষার অ-সারতা নিয়ে ইলিচের নেতৃত্বে নানান তর্ক – বিতর্ক শুরু হয়। আসলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিল তার জেহাদ যার ঢেউ গিয়ে পড়ে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। আর স্কুলের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি সবচেয়ে বেশি ধারালো ছিল। স্কুল ছিল ইলিচের কাছে "সোনার পাথর বাটি"। কীভাবে স্কুল ব্যবস্থার বেড়াজাল টপকে শিক্ষা সর্বজনীন হয়ে উঠবে এই ছিল তাঁর ভাবনা। ইলিচ মনে করতেন জীবন ধারণের প্রতিটি মুহূর্তে শেখা – জানার অভিজ্ঞতা তৈরি হয়। শিক্ষাকে পণ্য করে তুলেছে আজকের সমাজ। শিক্ষাকে ভোগ্যপণ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা

**স্কুল সংক্রান্ত কয়েকটি ধারণা যা আমরা বিশ্বজনীন সত্য বলে মনে করি ইলিচ সেই ভাবনার অচলায়তনে আঘাত করেছেন কড়া ভাষায়।**

করেছে স্কুল প্রথা। ওনার মতে স্কুল ব্যবস্থা আর শিক্ষা – এদুটির অবস্থান একে অন্যের বিপরীতে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিরোধী ছিলেন ইলিচ। শিক্ষাকে পণ্য করে বাজারে ছাড়ছে স্কুল। ধনতান্ত্রিক সমাজে স্কুল উৎপাদিত শিক্ষা এক নির্দিষ্ট বিনিময় মূল্য থাকে। আর এই সমাজে যাদের মুঠোয় মূলধন আছে তারা এই শিক্ষা – নামক পণ্যটি থেকে সবচেয়ে বেশি উপকার আদায় করতে পারে।

ফলে সর্বজনের জন্য উত্তম মানের শিক্ষা পরিষেবা স্কুলের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হবে না। ফলে স্কুলের ব্যবস্থার সাহায্যে সবার জন্য সমমানের উত্তম শিক্ষাপ্রদান অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। সর্বজনীন শিক্ষা প্রসারের জন্য চাই বিকল্প প্রতিষ্ঠান। স্কুল সংক্রান্ত কয়েকটি ধারনা যা আমরা বিশ্বজনীন সত্য বলে মনে করি ইলিচ সেই ভাবনার অচলায়তনে আঘাত করেছেন কড়া ভাষায়। সত্যগুলো যে আসলে অলীক অবাস্তব তাই তিনি বলতে চেয়েছেন। যেমনঃ-

আমরা বিশ্বাস করি যে স্কুল মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়। এই বিশ্বাসের ফলে তৈরি হয় স্কুলের চাহিদা। স্কুলের অস্তিত্ব স্কুলের চাহিদা বাড়ায়। স্কুল ব্যবস্থা আমাদের বোঝায় যে স্কুলে যাওয়ার সঙ্গেই মূল্যবোধ শেখা জানা জড়িয়ে আছে। স্কুল হাজিরার সঙ্গে শেখা – পড়া যেন সমানুপাতিক। বেশি বেশি করে স্কুলে গেলে শেখার মূল্য বাড়ে। এই শেখার মূল্য আবার পরিমাপ করা যায় নম্বর, গ্রেড, সার্টিফিকেটের সাহায্যে। ইলিচ এই ধারণাগুলিকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করেন। তাঁর কাছে শিক্ষা এমন এক মানবিক প্রক্রিয়া যাতে অন্যের হস্তক্ষেপ সবচাইতে কম লাগে। নিজের জীবনের সঙ্গে যোগ রয়েছে এমন পরিস্থিতিতে বাইরের কারুর নির্দেশ ছাড়াই পড়ুয়ারা নিজেরাই সবচেয়ে বেশি শিখে নিতে পারে। শেখার প্রক্রিয়া তাড়াতাড়ি ঘটে যখন পড়ুয়ারা এতে সক্রিয় ভাবে অংশ নেয়। ইলিচ মনে করতেন যে একজন ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব উন্নতি বা বেড়ে ওঠা কখনই স্কুল নির্ধারিত মাপকাঠির সাহায্যে বিচার করা যায় না। অথচ দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিক ভাবে আমাদের বোঝানো হয়েছে যে স্কুলের তৈরি মূল্যবোধ মাপা যায়।

ইলিচের মতে স্কুল পাঠক্রম বিক্রি করে। আর পাঁচটা বিপণন কেন্দ্রের মতো স্কুলের হাতে পড়ে শিক্ষা পণ্য হয় ওঠে। শিক্ষক যেন পণ্যবণ্টনকারী আর ছাত্র-ছাত্রীরা হলো উপভোক্তা। উপভোক্তাদের প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে যে ভাবে পণ্যের গুণমানে ঘষা-মাজা করা হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ের পাঠক্রম এই ভাবে তৈরি হয়। শিক্ষাকে পণ্য হিসাবে ভোগ করার সাথে সাথে তার উৎপাদন ও বৃদ্ধি ঘটানো হয়। এর জন্য তৈরি হয় ভুরি ভুরি ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট। আর এগুলোকে করায়ত্ত করতে চলে ইঁদুর দৌঁড়। পড়ুয়া, ছাত্র-ছাত্রীদের ইঁদুর দৌঁড়। যত ডিগ্রি তত যেন ভালো রোজগারের সুযোগ। পণ্য সর্বস্ব সমাজে এই ধারনায় চলে। বাজারে পণ্যের চাহিদা অনুসারে উপভোক্তারা যেমন নিজেদের ক্রেতা মানসিকতা

**তাঁর কাছে শিক্ষা এমন এক মানবিক প্রক্রিয়া যাতে অন্যের হস্তক্ষেপ সবচাইতে কম লাগে। নিজের জীবনের সঙ্গে যোগ রয়েছে এমন পরিস্থিতিতে বাইরের কারুর নির্দেশ ছাড়াই পড়ুয়ারা নিজেরাই সবচেয়ে বেশি শিখে নিতে পারে।**

তৈরি করতে সমাজের অন্যান্য অংশ যেমন – পরিবার, ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান, গণমাধ্যম প্রভৃতি ভূমিকা পালন করে। এর মধ্যে স্কুলের ভূমিকা সবচেয়ে গভীর ও সুদূরপ্রসারি। স্কুল ভিত্তিক শিক্ষার জয় জয়কারের মূলে আঘাত করেছেন ইলিচ। স্কুল শিক্ষার বাধ্যতামূলক অবস্থানকে আঘাত করেছেন তিনি। জ্ঞান আহরণ বা যে কোন শেখা যে একটা প্রক্রিয়া বার বার তিনি আমাদের মনে করাতে চেয়েছেন। আর এই শেখা-জানার প্রক্রিয়া কোন প্রতিষ্ঠানের চার দেওয়ালের আটকে থাকতে পারে না। সত্তরের দশকে ইলিচের ভাবনা

**স্কুল পাঠক্রম বিক্রি করে। আর পাঁচটা বিপণন কেন্দ্রের মতো স্কুলের হাতে পড়ে শিক্ষা পণ্য হয় ওঠে। শিক্ষক যেন পণ্যবন্টন-কারী আর ছাত্র-ছাত্রীরা হলো উপভোক্তা।**

শিক্ষাজগতে ঝড় তুলেছিল। তাঁর ভাবনার রেশ ধরে আজ আমরা সেই সব স্কুল দেখতে পাচ্ছি যারা পরিবেশ প্রকৃতিকে গুরুত্ব দেয়। যারা ছাত্র-ছাত্রীদের বাস্তব জীবনকে গুরুত্ব দেয়। এবং যারা সামাজিক ভাবে প্রাসঙ্গিক জ্ঞানচর্চাকে প্রাধান্য দেয়। তাঁর ভাবনা মৌলিকতা এতোটাই যে সেগুলোকে বাস্তবায়িত না করা গেলেও তাঁর ভাবনার অকাট্যতা আজ টের পাওয়া যাচ্ছে। ইলিচের স্কুল-হীন সমাজ ভাবনার প্রসার ঘটেছে আজকের শিক্ষাবিদদের মনে। তাঁর ভাবধারার সাহায্য নিয়ে এমন সব নীতি ও প্রকল্প তৈরি হচ্ছে যার সাহায্যে প্রথাগত ও প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষার মধ্যেকার সঙ্কট দূর করা সম্ভব হচ্ছে। আজকের দিনে প্রাপ্তবয়স্ক ও যুবকদের জন্য যে প্রথা বহির্ভূত শিক্ষাক্রম তার প্রস্তাবনায় আমরা

**যারা ছাত্র-ছাত্রীদের বাস্তব জীবনকে গুরুত্ব দেয়। এবং যারা সামাজিক ভাবে প্রাসঙ্গিক জ্ঞানচর্চাকে প্রাধান্য দেয়। তাঁর ভাবনা মৌলিকতা এতোটাই যে সেগুলোকে বাস্তবায়িত না করা গেলেও তাঁর ভাবনার অকাট্যতা আজ টের পাওয়া যাচ্ছে।**

ইলিচের ভাবনা দেখতে পাই। নানা ক্ষেত্রে যে জীবনভর শিক্ষাব্যবস্থা শুরু হয়েছে তাতেও পাই ইলিচের ছোঁয়া। আজ দেশে দেশে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি হয়েছে, তৈরি হচ্ছে গবেষণা ও তথ্য আদান প্রদানের নেটওয়ার্ক। এগুলোর সবই ইলিচের ভাবনায় ছিল। একমাত্র ইলিচের ভাবনাকে উপেক্ষা করে বাজার এখন রমরমিয়ে চলছে।

একে বদলাতে গেলে চাই ভীষণ এক বদল – যা ঘটতে হবে সমাজের সকল ক্ষেত্রে। অর্থনীতি থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, জীবন ধারণের মাত্রা, কাজের পরিবেশ, শক্তির ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিতে। এই ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে যুক্ত হবে জনসংখ্যা সমস্যা, দারিদ্র, বে-রোজগারি। আর এই ভীষণ বদলের লক্ষ্য হবে এক সমন্বয়পূর্ণ উন্নয়ন প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় মানুষের অস্তিত্ব নির্ভর করবে সৃজনশীলতা, মুক্তি ও উদ্দীপনার উপর আর যে প্রক্রিয়ায় প্রতিটি মানুষ অংশ নেবে উৎসাহের সঙ্গে।

# স্বরাজ বিশ্ববিদ্যালয়
## মুক্ত মেধা, মুক্ত শিক্ষার অনন্য উদযাপন

বিগত একদ শকেরও বেশী সময় ধরে তিনি মতাদর্শগত স্তরে এবং অনুশীলনের প্রেক্ষিতে ‘প্রতিরোধ’ করেছেন ‘কারখানা’ ঘরানায় শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক নীতিগুলিকে, তিনি প্রতিনিয়ত অক্লান্ত ভাবে বলে চলেছেন শিক্ষার অধিকার এর দাবি ‘রাষ্ট্র’ কেন্দ্রিক হয়ে পড়ার সমস্যা গুলি কোথায়, তিনি সারা দেশের গণতান্ত্রিক গণ – প্রতিরোধ গুলির সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন 'অন্য' শিক্ষার ভাবনা এবং অনুশীলন – তিনি মণীশ জৈন। রাজস্থানের 'শিক্ষান্তর' নামক সংস্থার প্রধান মানুষ। তাঁর এবং তাঁর অন্যান্য সমমতাবলম্বীদের উদ্যোগে আরাবল্লীর অসামান্য নিসর্গ লালিত উপত্যকার আবাসে গড়ে উঠেছে 'স্বরাজ বিশ্ববিদ্যালয়' যেখানে সিলেবাসের নিগড়ে শিক্ষার দমবন্ধ করা প্রতিবেশ। এর পরিবর্তে রয়েছে শিক্ষার্থীর নিজস্ব ভাবনা-স্পন্দিত পাঠক্রম চয়নের সুবিধা এবং সুযোগ। এখানে ‘হাড়হিম’ করা ‘জ্ঞানের শিখরে’ বসে থাকা শিক্ষকের বদলে রয়েছে 'প্রক্রিয়া সঞ্চালক'। এখানে রয়েছে ঐতিহ্য আধুনিকতা পরম্পরার মিথস্ক্রিয়ায় লালিত জ্ঞানের অনুশীলনের সুযোগ। অথচ ‘আধুনিক’ পৃথিবীর জ্ঞানচর্চার পথবন্ধ করা হয়নি এক মুহূর্তের জন্যও। ২০১০ সালে পথ চলা শুরু করার পর প্রচুর ছাত্রছাত্রী এসেছেন ‘দু-বছরের’ মুক্তপাঠের অংশীদার হতে, এখানে তাদের নাম ‘খোঁজী’ – অর্থাৎ যিনি নিরন্তর এক সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। এখানে তারা শিখেছে সংস্কৃতির অন্য অভিজ্ঞান, যেখানে পাশ্চাত্যের অত্যাধুনিক জ্ঞানতত্ত্বের সাথে নিপুণ মেলবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে স্থানীয় ভাবে বহমান জ্ঞানের। এই জ্ঞান অনার্য ভারতের প্রাকৃতিক – বাস্তুতান্ত্রিক জ্ঞানের একটা চেতনা সমৃদ্ধ ছবি তুলে ধরে।

‘স্বরাজ বিশ্ববিদ্যালয়’-এ পাশ্চাত্যের কোনো অভিজ্ঞানকে যেমন বিনা দ্বিধায় ‘সত্য’ বলে মেনে নেওয়া হয় না, তেমন ভাবে যেকোন প্রতীচ্য – দর্শন-ই ‘শত্রু’ এই ধরনের ভাবনাও এখানে প্রশ্রয় পায় না। পাঠক্রমে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বিশ্বায়ন এবং তথাকথিত ‘পশ্চিম’ – নিয়ন্ত্রিত আধুনিকতার Critique এর ওপরে, এর পাশাপাশি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে যাতে এই পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে প্রতিজন ‘খোঁজী’ হয়ে উঠতে পারে। প্রকৃত অর্থে একজন সামাজিক উদ্যোগী, যে উদ্যোগ তাঁরা নেবেন সেখানে মিশে থাকবে সামাজিক, বাস্তুতান্ত্রিক এবং সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতা, শুধুমাত্র ‘ব্যবসা’ – সাফল্য দিয়ে তাঁদের উদ্যোগকে পরিমাপ করার চেষ্টা করা যে বাতুলতা এবং ভ্রান্তি তা খুব ভালো ভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছেন ‘স্বরাজ বিশ্ববিদ্যালয়’ এর শিক্ষকরা।

এই সমগ্র উদ্যোগের দর্শনগত প্রেক্ষিতে রয়েছে ইভান ইলিচের ‘De Schooling’ এর তত্ত্ব, যেখানে ইভান দেখিয়ে ছিলেন আসলে ‘স্কুল’ ব্যবস্থা পুঁজিবাদী – উৎপাদন ব্যবস্থার সাংস্কৃতিক – রাজনৈতিক বৈধতা নির্মাণের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। এখানে মণীশ জৈন এবং তাঁর বন্ধুরা যা করেছেন তা এই পুঁজি কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিপ্রতীপে একটা মতাদর্শগত সৌধ নির্মাণের পরিসর। এই উদ্যোগ খুব সুখের কথা, পেয়েছে নাসিকের ‘অভিব্যক্তি’ বা বৃটেনের ‘স্কোল ফাউন্ডেশন’ এর মতো প্রতিষ্ঠানের সাহচর্য। আমরা ‘নবদিশা’ ভাবনা ও উদ্যোগের পক্ষ থেকে এর আরো নিবিড়তা কামনা করছি।

শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ।
চলবে তার সঙ্গে একতালে একসুরে।
সেটা ক্লাস নামধারী খাঁচার হবে না।

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# ভিন্ন মতের অধিকার
# অথবা অধিকার প্রসঙ্গে ভিন্নমত

পুঁজি-কেন্দ্রিক রাষ্ট্র প্রসবিত অধিকার যে কোনো মতেই তার উৎপাদন ব্যবস্থার কাঠামোগত বিন্যাসকে অতিক্রম করতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। তবু বিভিন্ন রাষ্ট্র-প্রদত্ত এবং সাংবিধানিক ভাবে ‘বিশুদ্ধ’, সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ইত্যাদি নানা ভাবে বর্গায়িত অধিকারগুলি নিয়ে গত ২০-২৫ বছর ধরে বেশ কিছু ‘স্বেচ্ছাসেবী’ পেশাদার বা ‘পেশাদার’ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উৎসাহ এবং নানা ভাবে তাদের কর্মসূচীতে অধিকার ভাবনা তুলে আনার তোড়জোড় রীতিমত লক্ষ্যণীয় আকার ধারণ করেছে। শিক্ষার অধিকার এই তালিকায় বেশ প্রথমের দিকে। কারণ তুলনায় এর প্রকৃতি নরম ------- সংবিধান অথবা কয়েকটি জাতীয়, আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র থেকে যদি কয়েক লাইন জায়গা মতো তুলে বসিয়ে দেওয়া যায় আর পুরোনো EPW বা ‘বামপন্থী’ দু-একটি পত্র পত্রিকার পাতা থেকে তুলে আনা যায় শিক্ষায় ব্যয় বরাদ্দের সংখ্যাতত্ত্ব, তাহলে হয়তো শিক্ষার অধিকার ভাবনার অগ্রচারী ভাবুক হিসেবে NGO মহলে সুনাম হতে সময় লাগবে না ---- অন্তত এই কলকাতায় বেশ কিছু সংস্থার তা লাগেনি।

চরাচর ব্যাপী একটা ছদ্মবেশী মধ্যমেধা এমন আগ্রাসী রূপ নিয়ে হাজির হয়েছে যে সেখানে নতুন চিন্তনের সামান্যতম ভাবনাও এইসব অগ্রচারী ‘সৈনিক’ রাও বাতিল করে দেবে নৈরাজ্যবাদী বলে। অথচ এরা যখন বিনায়ক সেনের মুক্তির দাবীতে ‘সই’ সংগ্রহ করেন একবারও রাষ্ট্রকাঠামোর বিরুদ্ধে কথা বলেন না, এরা যখন ‘সেজ’ এর বিরুদ্ধে কথা বলেন পুঁজিবাদের সর্বসাম্প্রতিক স্তরের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে নয়, বরঞ্চ একে দেখেন ‘মানবাধিকার’ লঙ্ঘনের কাহিনী হিসেবে। এরা যখন জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে বলেন তাতে পুঁজিবাদের আদিম সঞ্চয়নের প্রনালী বিরোধিতা নয়, আসলে যা থাকে তা হলো সেই জমি অধিগ্রহণের সময় ‘নারকীয়’ পুলিশী অত্যাচার এবং অদ্ভুত একটা গণতন্ত্রের জন্য চিরকালীন আকাঙ্ক্ষাজনিত বিশ্বাস।

যাই হোক তবু এর মধ্যেই রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত মানবাধিকার এর বিভিন্ন সমীকরণের সীমাবদ্ধ চরিত্রগুলি নিয়ে অনেক নতুন ধারার বিশ্লেষণ হয়ে চলেছে। একযুগেরও বেশী আগে ২০০০ সালে শিক্ষাবিদ দয়াল চন্দ্র সোনি সংবিধানের ৪৫ নং ধারায়, অর্থাৎ রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিতে, বর্ণিত ১৪ বছর পর্যন্ত মৌলিক শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের এই মহান সন্দর্ভের বিরোধিতা করেছেন। তিনি খুব দ্ব্যর্থহীন ভাবে আমাদের জানিয়েছেন তার আপত্তি এবং বিরোধিতার প্রধান প্রধান জায়গাগুলি। তার প্রধান বিরোধিতা ‘বাধ্যতামূলক’ বাতারবরন-টি নিয়ে। তিনি জানিয়েছেন বাধ্যতা কখনো শিক্ষার প্রাথমিক শর্ত হতে পারে না। তিনি আরও জানিয়েছেন সংবিধান এবং রাষ্ট্র অদ্ভূত ভাবে নীরব ‘শিক্ষা’ বলতে আমরা কি বুঝবো তা নিয়ে। এখানে শিক্ষাব্যবস্থা এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থা পুরোপুরি সমার্থক আকার ধারণ করেছে। এই বাধ্যতামূলক পরিসরে মনে হয় ‘সরকার’ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা যা প্রসব করবে তাই ‘সত্য’ এবং তার মতে বাইরে যা, তার সাথে শিক্ষার কোন যোগ নেই। তার মতে ‘শিক্ষা’ হলো ‘গুরু-শিষ্য’ পরম্পরা-প্রবাহিত এমন এক ধারা যেখানে সরকার এর ভূমিকা খুব সামান্য এবং সেখানে যদি সরকার নিয়ন্ত্রণকারীর আসনে বসে তবে বিপদ আসন্ন। তিনি দেখিয়েছেন এই ধনতন্ত্রের গরিমায় আচ্ছন্ন সমাজ কিভাবে শিশুকাল থেকেই রোপণ করে বিভেদের বীজ। কারণ ধনী পরিবারের সন্তানরা কখনো দরিদ্রদের জন্য নির্ধারিত বিদ্যালয়ে যেতে বাধ্য নয় এবং সর্বোপরি তিনি আক্রমণ করেছেন শিক্ষার অধিকার এর দর্শনগত ভূমিকে। তিনি জানিয়েছেন এত কিছুর পরেও পরিষ্কার নয় ‘শিক্ষিত’ মানুষ মানে কি ? আমাদের অধিকারবাদী বন্ধুরাও শিক্ষার দর্শনগত প্রেক্ষিত নিয়ে পুরোপুরি নীরব। এখানেই তারা যেন অস্বস্তির বোধে ভুগছেন।

তবু ভালো পরিব্যাপ্ত মধ্যমেধার সাজানো বাগানে এখনো মাঝে মাঝে ‘নৈরাজ্যের’ সুবাতাস দেখা দেয় ঝড় হয়ে।

গ্রামের এক মূর্খ ধনী লোক শহর ভ্রমণে বেরিয়েছেন। পথিমধ্যে তিনি লক্ষ্য করলেন একটি বড় বিল্ডিং। কৌতূহলবশত সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন এটা কী? কর্তব্যরত কর্মকর্তা বললেন এটা বিশ্ববিদ্যালয়। পাল্টা প্রশ্ন, এখানে কী করা হয়? তিনি বললেন, এখানে ডিগ্রি দেওয়া হয়। তার ডিগ্রি নেয়ার শখ হলো, তাই তিনি বললেন, আমাকে একটি দেওয়া যাবে ? তিনি বললেন, ১০০ ডলার লাগবে। তিনি ডিগ্রি নিয়ে ফেরার পথে চিন্তা করলেন তার ঘোড়ার জন্য একটি ডিগ্রি নেয়া দরকার। তাই তিনি গিয়ে বললেন, ভাই আমার ঘোড়াটার জন্য আরেকটি ডিগ্রি দেন । কর্মকর্তা বললেন, এখানে শুধু গাধাদের ডিগ্রি দেওয়া হয় ঘোড়াদের নয়।

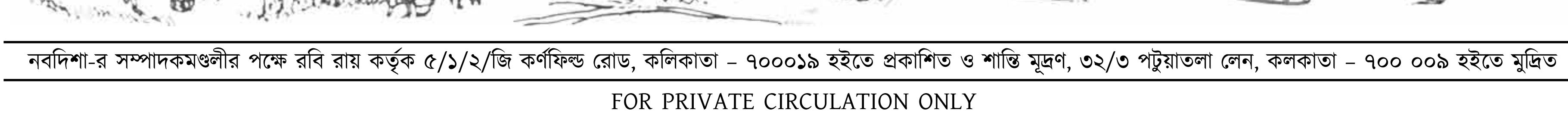

নবদিশা-র সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবি রায় কর্তৃক ৫/১/২/জি কর্ণফিল্ড রোড, কলিকাতা – ৭০০০১৯ হইতে প্রকাশিত ও শান্তি মূদ্রণ, ৩২/৩ পটুয়াতলা লেন, কলকাতা – ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত

FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY